# সেতুবন্ধ

কবিতাভবন ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ থেকে
বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক প্রকাশিত

প্রচ্ছদশিল্পী : সৌরেন সেন

রচনাকাল ১৯৩৯
প্রথম প্রকাশ
৩ শ্রাবণ ১৩৫৪
জুলাই ১৯৪৭

আড়াই টাকা

১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ দি ইষ্টার্ন টাইপ ফাউণ্ড্রারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং
ওয়ার্কস লিমিটেড থেকে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে বি-এস-সি কর্তৃক মুদ্রিত।

# সেতুবন্ধ

প্রতিভা বসু

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা

মা ও বাবাকে

প্রতিভা বসু প্রণীত * কবিতাভবন প্রকাশিত

মাধবীর জন্য * মনোলীনা * সুমিত্রার অপমৃত্যু

বিচিত্র হৃদয় * সেতুবন্ধ

# সেতুবন্ধ

১

আমার রোজ মনোহারি দোকানে দরকার থাকে। সন্ধে হ'লেই আমি আর সেখানে না-গিয়ে থাকতে পারি না। এদিকে বাবার এক বাই, বিকেল হ'লেই মোটরে চড়িয়ে হাওয়া খেতে নিয়ে যাবেন লেকে, কোনো ওজর-আপত্তি মানবেন না।

মাসের প্রথমেই বরাবর আমাদের যার যা দরকার তা আসে; শেষের দিকে আর-কারো কিছু টান পড়লেও আমার আমার কখনো পড়তো না, কিন্তু ছোটো ভাইয়ের জন্য একদিন চকোলেট কিনতে গিয়েই এটা হ'লো।

ঘুষ দিয়ে ওর কাছ থেকে সর্বদাই আমি কাজ আদায় করি— তাই সেদিন এক বন্ধুর বাড়ি থেকে ফেরার পথে এক মনোহারি দোকান দেখে হঠাৎ মনে হ'লো, ওর জন্যে কিছু চকোলেট কিনলে হয়। নামলাম গাড়ি থেকে। আমার বাবার গাড়ি শহরের অনেক মানুষের মতো দোকানিদেরও সচকিত করলো—তার উপর আমার নিজের সাজসজ্জা। দু'-তিন জন এগিয়ে এলো একসঙ্গে—আমি নেহাৎ অবজ্ঞাভরে বললাম, 'ভালো চকোলেট আছে?' আমার গলার স্বরে এইটেই ছিলো যে আমি

যাকে ভালো বলি তা এ-দোকানে না-থাকাই সম্ভব। দোকানের এক কোণে একটা চেয়ারে ব'সে সামনে ছোটো টেবিলের উপর মুখ নিচু ক'রে যে-ভদ্রলোক লিখছিলেন, হঠাৎ চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে।

এমন একটা সলজ্জ বিনম্র ভঙ্গি ছিলো তাঁর মুখে যে পরের দিন সন্ধেবেলাও মনে হ'লো ও-দোকান থেকে ভালো একটা রাইটিং প্যাড আমার আর না-কিনলেই চলছে না। আর যেহেতু পাড়ার মধ্যে ওটাই সবচেয়ে বড়ো না-হ'লেও বেশ বড়ো দোকান, তখন একটু ঘুর-পথ হ'লেও সেখান থেকে কেনাই ভালো। লেকে হাওয়া খেয়ে ফেরবার পথে বাবাকে গাড়ি ঘোরাতে বললুম। বাবা বললেন, 'ভালো রাইটিং প্যাড এখান থেকে কিনবি কী রে, কাল চলিস আমার সঙ্গে আর্মি-নেভিতে।' কী মুস্কিল! বললাম, 'না বাবা, সামান্য একটা রাইটিং-প্যাড, তা আবার সায়েববাড়ি —এখান থেকেই কিনবো।'

'ওরে বাবা—' বাবা ঠাট্টা করলেন, 'স্বদেশপ্রীতি হয়েছে দেখছি আবার। আচ্ছা চল—' এই বলে ঠাশ ক'রে অন্য একটা মনোহারি দোকানের সামনে গাড়ি থামালেন। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আরে এখানে না, ঐ যে মোড়ের দোকানটায়, কী জানি নাম—'

ড্রাইভার কিন্তু বুঝলো, সঙ্গে-সঙ্গে সে গাড়ি ঘোরালো কালকের দোকানের দিকে।

বাবা বললেন, 'তুই আসিস নাকি মাঝে-মাঝে এখানে ?'

'মাঝে-মাঝে আবার কবে এলাম !' বাবা একান্ত সরল মনেই বলেছিলেন কথাটা, কিন্তু আমার জবাবটা একটু উগ্র হ'লো। বাবা গাড়িতেই থাকলেন, আমি নামলাম প্যাড কিনতে।

ঠিক সেই দৃশ্য। ভদ্রলোক তেমনি ব'সে লিখছেন, কর্মচারীরা তেমনি বেগে এগিয়ে এলো।

'ভালো রাইটিং প্যাড আছে ?

আড়চোখ লক্ষ্য করলাম ভদ্রলোককে। গলা শুনে বুঝেছেন নিশ্চয়ই কালকের খদ্দের—তাকিয়ে দেখা আর দরকার মনে করলেন না।

এদিকে আমার পছন্দ হয় না —কর্মচারীরা গলদঘর্ম। একজন গিয়ে তাঁকে মৃদুস্বরে কী বললো—তিনি জবাব দিলেন, 'এর চেয়ে দামি আর নেই।'

কী আর করি, অবশেষে অকারণে অনেকগুলি প্যাড নিয়ে এসে গাড়িতে উঠলাম। বাবা বললেন, 'হ'লো ?—তুইও শেষে তোর মার স্বভাব পেলি ?'

একটু হেসে বললাম, 'কী করবো বলো, যা দেখি তা-ই পছন্দ হয়। এরা লোকও খুব ভালো'। একটু পরে বললাম— 'আচ্ছা বাবা, এঁদের থেকেই তো আমরা সমস্ত মাসেরটা নিলে পারি।'

'ওদের থেকে?'—বাবা অবজ্ঞার হাসি হাসলেন—'তোর একলা এক মাসের জিনিশ জোগাতেই তো ওদের দোকান ফতুর হ'য়ে যাবে রে।'

বাবার ভয়ানক নাক উঁচু। কথা বললাম না আর।

পরের দিন সন্ধেবেলা কিন্তু আমার আবার যাবার দরকার হ'লো। দরকার—দরকারের তো কোনো নির্দিষ্ট কারণ থাকে না—মনের কাছে কৈফিয়ৎ দেবার এর চেয়ে অন্য সুবিধে আর নেই। জীবনে যার চার পয়সার পেনসিলেরও দরকার ছিলো না—না-চাইতেই যে চিরদিন পরিপূর্ণভাবে পেয়ে এসেছে, তার যে হঠাৎ এমন রোজ-রোজ দোকানে যাবার দরকার হ'তে পারে এ-কথা কি সে নিজেও জানতো? মা বললেন, 'কী আনবি? রুমাল? কেন, এই না সেদিন এক ডজন—'

আমতা-আমতা ক'রে বললাম, 'না, ঠিক রুমাল নয়, তবে থাক—'

'বল না কী—তোরই যে যেতে হবে তার কী মানে—রামদিন এনে দেবে'খন। কাগজে লিখে দে।'

'না থাক—' ঐ প্রসঙ্গ চাপা দিই তাড়াতাড়ি। মন কেমন উশখুশ করতে থাকে যেন।

পরের দিন কিন্তু গেলামই। সন্ধেবেলা না—একেবারে ভরা দুপুরে। বাবা গেছেন কোর্টে—মা তাঁর ঘরে বোধ হয় ঘুমিয়েছেন—বাহাদুরকে গাড়ি বার করতে বললাম। হঠাৎ মনে

হ'লো দুপুরবেলাটা ব'সে-ব'সে নষ্ট করি কেন—একটু ছবি-টবি আঁকার চেষ্টা করলেও তো হয়। কিন্তু কাগজ? পেনসিল? রং তুলি?—সে তো আবার এক মনোহারি ব্যাপার। নিজের কাছে নিজেরই একটু লজ্জা করলো, কিন্তু আমল দিলাম না। দোকানে গিয়ে দেখলাম এই ভরা দুপুরে কর্মচারীরা কেউ নেই—চারদিকে কালো পরদা ফেলে ভিতরে পাখা চালিয়ে সেই ভদ্রলোক চুপচাপ ব'সে-ব'সে ইংরিজি উপন্যাস পড়ছেন। আমার জুতোর আওয়াজে চমকে চোখ তুলতেই আমি থমকে দাঁড়ালাম। অদ্ভুত চোখ। ঈষৎ শ্যামল ছিপছিপে চেহারা—পাৎলা আদ্দির পাঞ্জাবির আবরণে অপরূপ দেখাচ্ছে। কথা বলতে আমার আটকে গেলো। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী চান?'

কী যে নিতে এসেছি তা আমি সত্যি ভুলে গিয়েছিলাম। সত্যিকারের দরকার তো আমার ছিলো না—মনেই করতে পারলাম না যে হঠাৎ আমার ছবি আঁকার শখ হয়েছিলো। ঢোঁক গিলে বললাম, 'এই কয়েকটা—' এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললাম, 'কয়েকটা রুমাল নেব।' রাজ্যের রুমাল বার করে নিয়ে এলেন ঘেঁটে-ঘেঁটে (যথাসম্ভব দেরি ক'রে) অবশেষে খানকয়েক পছন্দ করতে হ'লো। কিন্তু এক্ষুনি ফিরে যাবো? বললাম, 'ফাউন্টেন পেন আছে—শস্তা দামের—এই দশ টাকার মধ্যে?'

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বার করলেন কলম। কলম দেখতে

অনেক সময় গেলো। নিচু হ'য়ে নিব পরীক্ষা করতে দু'জনেই এত বেশি মন দিলাম যে কাউণ্টরের দু'পাশ থেকে আমাদের দু'জনের মাথা একবার সাংঘাতিক কাছাকাছি হ'য়ে গেলো।

আরক্ত হ'য়ে মুখে তুলে বললাম, 'কলম আজ থাক, রুমাল-গুলোই বেঁধে দিন।'—টাকা বার করলাম ব্যাগ থেকে।

'আজ বেস্পতিবার—দোকানে আজ বেচা-কেনার নিয়ম নেই।'

'সে কী!'—আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

সলজ্জ হাসিতে তার মুখ ভ'রে গেলো। যথাসম্ভব গলা নিচু ক'রে বললো, 'বেশ তো, পছন্দ করতে তো আইন লাগে না—আজ পছন্দ ক'রে গেলেন—কাল এসে নেবেন।'

ঈশ! আমার তো আর কাজ নেই। ভয়ানক রাগ হ'লো কথা শুনে—একটু ঝাঁজ দিয়ে বললাম, 'সে-কথা এতক্ষণ বলেননি কেন?'

'বললে আপনি দুঃখিত হতেন।'

'দুঃখিত! দুঃখিত আমি এতেই হলাম—কী আশ্চর্য! অনর্থক এতক্ষণ আমাকে ভোগালেন!'—মুখ-চোখ গম্ভীর ক'রে সবেগে বেরিয়ে এলাম আমি। গাড়িতে উঠে মুখ বার ক'রে দেখি, সেও বেরিয়ে এসেছে আমার পিছনে-পিছনে। চোখে চোখ পড়তেই মুখ নিচু ক'রে বললো, 'কাল আসবেন।' ড্রাইভর গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে ততক্ষণে, আমি জবাব দিলাম না—কিছুদূর এগিয়ে এসে চকিতে মুখ ফেরালাম পিছনে,

দেখলাম সেই অদ্ভুত দুই চোখ মেলে সে তাকিয়ে আছে গাড়ির দিকে।

পরের দিন অনেক মন-কেমন-করা সত্ত্বেও আমি আর গেলাম না, তার পরে পর-পর একেবারে পাঁচ দিন না। কিন্তু ইতিমধ্যে এক কাণ্ড ঘটলো। আমার বাবার বন্ধুপুত্র অভিলাষ (আমার ভাবী স্বামীও বলা যায়) হঠাৎ এসে উপস্থিত। সে কৃষ্ণনগরে পোস্টেড। আই. সি. এস. হবার পরে এই তার সঙ্গে ভালো ক'রে দেখাশুনো। চেহারায় কথাবার্তায় মেজাজে একেবারে পুরোদস্তুর আই. সি. এস. হ'য়ে এসেছে। আমার মা বাবা দিশে-হারা হ'য়ে উঠলেন তার পরিচর্যায়। আমি দিনের মধ্যে কম ক'রেও দশবার শাড়ি ব্লাউজের শ্রাদ্ধ করতে লাগলুম, পাউডরের প্রলেপে মুখের আসল রং মুছে ফেললুম, মাথা আঁচড়াবার ঘটায় তিনখানা চিরুনি দাঁত-ভাঙা হ'য়ে এখানে-ওখানে গড়াতে লাগলো। বাড়িতে একখানা ব্যাপার বটে।

২

আমার বাবা বড়োমানুষ। এডভোকেট তিনি, ডেলি ফী তাঁর পাঁচশো টাকা। প্রকাণ্ড গাড়ি বাড়ির মালিক তো বটেই, চাল-চলনও আমাদের একটু নাক-উঁচু ভাবের। আমার মার সঙ্গে আগে এ নিয়ে বাবার তর্ক হ'তো, আমাদের এ-সব ফ্যাশন, আর সকলের প্রতিই অবজ্ঞাভাব সর্বদাই তাঁকে আহত করেছে।

ভালো লাগেনি তাঁর বাবার হাব-ভাব। আমাদের (আমাদের মানে—একমাত্র মেয়ে আমি আর আমার ছোটো ভাই মণ্টু) তিনি চেষ্টা করেছিলেন অন্যভাবে গড়তে—ছেলেবেলায় আয়ার ছেলের সঙ্গে খেলা করবার অনুমোদন তাঁর সর্বদাই ছিলো—আশে-পাশের বাড়ির ছেলেমেয়ের সঙ্গে ভাব করিয়ে দিতেন—কিন্তু হ'লে কী হবে—অতিশয় বিলাসিতার মধ্যে বেড়ে উঠে স্বভাবটা ঠিক বাবার মতো হ'য়ে গেলো। আমাদের অবস্থার সঙ্গে যাদের এক আর একশোর তফাৎ তাদের সঙ্গে গলাগলিতে বেশ আত্মসম্মানে বাধতো। সর্বদাই তাদের করুণার চোখে দেখেছি—কথা ব'লে ভেবেছি ধন্য করলাম। আমার বাবার বন্ধু অভিলাষের বাবা পূর্ববঙ্গের এক বিখ্যাত ধনী—আর ধনী ব'লেই বাবার বন্ধু। তবে শুনেছি অভিলাষের বাবা মানুষটি ভারি ধড়িবাজ, আর তাঁর ধনপ্রাপ্তির মূলেও এক ধূর্তামির ইতিহাস আছে ব'লে শুনেছি। সে যা-ই হোক, টাকা তাঁর সত্যিই আছে।—এদিকে একমাত্র পুত্র অভিলাষ। আমার মা অভিলাষকে কী জানি কী কারণে স্নেহ করেন—মায়ের সম্বন্ধে এটুকু বুঝি যে আর যে-কারণেই হোক, আই. সি. এস. ব'লেও নয়—বড়োমানুষের পুত্র ব'লেও নয়। এমনিই হয়তো ভালো লাগে। বোধ হয় বিলেত থেকে ফিরে এসেই যেবার দেখা করতে এলো সেবার নিচু হ'য়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলো ব'লে। মায়ের তো আবার ও-সব ভাব আছে।

খুব ছেলেবেলায় আমরা অনেকদিন এক জায়গায় ছিলাম। অভিলাষের বাবা তখন হাওড়াতে কাপড়ের ব্যবসা করছিলেন। এত একসঙ্গে থাকার ফলেই কিনা জানি না—অভিলাষকে ভালোবেসেছি, কিন্তু বিয়ে হবে ভেবে কেমন উৎফুল্ল হয়ে উঠিনি—প্রাণের মধ্যে কোনো সাড়াই পাইনি। অভিলাষের দিক থেকেও হয়তো তা-ই, কে জানে। বাবাতে বাবাতে বিয়ে ঠিক ক'রে রাখলেন তখন থেকেই। এর পরে অনেক দিন ছাড়াছাড়ি গেছে, আমরা তখন বড়ো। অভিলাষ ম্যাট্রিক পড়ছে, আমি বোধ হয় —ফিফথ ক্লাশ কি ফোর্থ ক্লাশে।

তারপর আমি যে-বছর সিনিয়র কেম্ব্রিজ দিলাম সে-বছর ও বিলেতে—ফিরে এসেছে বছর খানেক—আমার বাবা ফেরবার পর থেকেই তাগাদা দিচ্ছেন অভিলাষের বাবাকে, কিন্তু তিনি বোধ হয় এর চেয়ে ভালো শিকারের সন্ধানে ছিলেন, তাই এতদিন তা-না-না-না ক'রে কাটিয়ে মাস খানেক আগে একখানা চিঠিতে লিখেছেন, অভিলাষ শীঘ্রই সমস্ত ঠিক করতে যাচ্ছে।

অভিলাষের আগমনের উদ্দেশ্যটা এবার বোঝা গেলো। আমার মা আমাকে বললেন, 'কী রে রুনি, অভিলাষকে কেমন লাগছে এতদিন পরে?' আমি হেসে বললাম, 'অভিলাষকে বরাবরই আমার এ-রকম লাগে।'

'বেশ! বিয়ে হবে দু'দিন পরে—' মা মুখ ঘুরিয়ে অন্য কাজে

যেতে-যেতে বললেন, 'এত দেখাশোনা হলে কি আর কোনো মোহ থাকে, না আনন্দ থাকে ?'

আমার বাবার আই. সি. এস্-এর উপর খুব ভক্তি—সেই দশ বছর বয়সের অভিলাষকে তিনি একেবারে মুছে ফেলেছেন মন থেকে—এমন কি আই. সি. এসের ভাবী স্ত্রী ব'লে আমার উপরও তাঁর যত্ন বেড়ে গেছে।

বিকেলবেলা অভিলাষ চা খেতে-খেতে বললো, 'আমি তো ভাবছি মাসখনেকের মধ্যেই বিয়েটা সেরে ফেলবো।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কী বলো, রুনি ?' আমি সলজ্জ হলাম না, কিন্তু কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলাম। মা জবাব দিলেন, 'আমাদের সকলেরই তো তা-ই মত। এখন তোমার বাবা—'

'বাবা—' অভিলাষ হেসে ফেললো, 'বাবার মতামতের জন্য আমি ব'সে আছি নাকি ?'

'না, তা থাকবে কেন—' মা বললেন—'বড়ো হয়েছো, উপযুক্ত হয়েছো, বুদ্ধি হয়েছে—বিয়ে তুমি নিজেই করবে, কিন্তু তাহ'লেও তো তাঁর অনুমতি চাই—আর যেখানে জানাই যে অনুমতি তুমি পাবে।'

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'অভিলাষ, তুমি যদি কিছু মনে না করো তাহ'লে আমি উঠি।'

'ওঠো, ওঠো, বাঃ—আমিও এক্ষুনি উঠবো।' সঙ্গে-সঙ্গে অভিলাষও উঠলো।

বাবা এমন সময় ঘরে এলেন—কোর্ট থেকে ফিরতে আজ তাঁর বড়োই দেরি হ'য়ে গেছে। আমাদের একসঙ্গে উঠতে দেখে খুশি হলেন বোধ হয়—ভাবলেন আর ভয় নেই। হাসিমুখে বললেন, 'কী, তোরা বেড়াতে যাচ্ছিস নাকি?' আমার আগেই অভিলাষ বললো, 'আমার তো তা-ই ইচ্ছে—' ব'লে তাকালো আমার দিকে।

বাবা হেসে বললেন, 'তোমার ইচ্ছেই ওর ইচ্ছে—ওর আবার আলাদা ইচ্ছে আছে নাকি?' আমার পিঠে চাপড় মেরে হেসে বললেন, 'কী বলিস?'

আমি জবাব না-দিয়ে নিজের ঘরে চ'লে এলাম। একটু পরেই বাইরে থেকে অভিলাষের গলা এলো, 'তোমার হ'লো?'

'আমি যাবো না।'

'কেন?'

'মাথা ধরেছে।'

'তাই নাকি—' অভিলাষ ব্যস্ত হ'য়ে দরজায় টোকা দিয়ে বললো, 'আসবো?'

বুঝলাম মাথা-ধরার ভাণকে অভিলাষ টিপে-টিপে সত্যিকারের মাথা-ধরা না-বানিয়ে ছাড়বে না। হেসে বললাম, 'আরে পাগল নাকি—আমি কাপড় পরছি যে।'

'বললে যে মাথা ধরেছে।'

'ঠাট্টাও বোঝো না?'

গলার স্বরে যথাসম্ভব আবেগ দিয়ে বললো, 'অসুখ-বিসুখ নিয়ে আবার ঠাট্টা কী।'

চট ক'রে বেরিয়ে এলাম শাড়ি প'রে।

সমস্ত লেকটা একবার চক্কর দিয়ে অভিলাষ বললো, 'এবার চলো নিরালা একটু বসি।'

আমি তক্ষুনি প্রতিবাদ ক'রে বললাম, 'না, না, বসে-ট'সে কাজ নেই, গরমের দিন কোথায় কোন সাপ ব'সে আছে।'

'পাগল—এই রোক্কো।'

গাড়ি থেমে গেলো। ঘোরতর অনিচ্ছাসত্ত্বেও আর প্রতিবাদের সময় পেলাম না।

মাড়োয়ারি ক্লাবের বাঁয়ের রাস্তা ধ'রে একটু দূরে গিয়েই অভিলাষ মনোমতো জায়গা পেলো।

'বাঃ, কী সুন্দর জায়গা—' পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে পেতে বললো, 'বোসো।'

'ও মা—রুমালে বসবার কী হয়েছে আমার।' ঘাসের উপর ব'সে পড়লাম।

অভিলাষ বললো, 'বিয়েতে নিশ্চয়ই তোমার অমত নেই।'

'অমত কিসের।'

'হ'তে তো পারে।'

'হ'লেই বা উপায় কী—বাংলা দেশের মা-বাপের মতে তো তোমার চেয়ে ভালো পাত্র আর নেই।'

'ও, মা-বাপের মরজিমতোই তাহ'লে আমাকে পছন্দ হয়েছে তোমার। পিতৃমাতৃভক্তি দেখছি বিদ্যাসাগরকে ছাড়িয়েছে।'

'মা-বাপের মরজি কেন?' বিষণ্ণ মুখে ঘাস তুলতে-তুলতে বললাম 'তোমার আমার বিয়ে হবে এ তো স্বতঃসিদ্ধ কথা।'

অভিলাষ একটু অভিমান ক'রে মুখ ফিরিয়ে বললো, 'তুমি খালি এড়িয়ে যাচ্ছো—নিজের মন আসলে সাড়াই দেয়নি।'

'মন সাড়া দেয়া কাকে বলে তা আমি জানি না—তোমাকে তো নতুন দেখছি না।'

অভিলাষ অকস্মাৎ আমার অত্যন্ত কাছে স'রে এলো; হাতের মধ্যে আমার হাত টেনে নিয়ে বললো, 'আমার তো তোমাকে ভয়ানক নতুন লাগছে। তোমার বয়স কি তুমি জানো?'

গম্ভীর হ'য়ে বললাম, 'জানি।'

'তোমার সমস্ত শরীরে কী-বিদ্যুৎ, তা কি তুমি জানো?'

'জানি।'

'তবে?'—হঠাৎ অভিলাষ আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

'ছি ছি—' আমি সবেগে স'রে আসতে চেষ্টা করলাম ওর সান্নিধ্য থেকে, কিন্তু অভিলাষ ছাড়লো না—জোর ক'রে ধ'রে চুম্বন করতে-করতে বললো, 'তোমরা ভারতবর্ষের মেয়েরা একেবারে জড় পদার্থ—আজ বাদে কাল বিয়ে, এখনো তোমার একটুও সংস্কার কাটলো না। বিলেতে কোর্টশিপের সময়টাই তো সবচেয়ে মজার।'

আমার মুখ কাগজের মতো শাদা হ'য়ে গেলো—প্রাণপণে নিজেকে ছাড়িয়ে এনে সোজা মোটরে এসে উঠলাম।

'হাউ সিলি!' অভিলাষ হাসতে-হাসতে পাশে এসে ব'সে বললো, 'ভারি ছেলেমানুষ আছো।'

পাশে ব'সেও সে রেহাই দিলো না—হাত দিয়ে আমার কোমর জড়িয়ে ধরলো। আবার তক্ষুনি ছেড়ে দিয়ে বললো, 'না, আর তোমাকে ভয় দেখাবো না—বোকা!' ব'লেই গালে টোকা দিলো।

গাড়ি যখন চৌরাস্তায় এলো—সেই মনোহারি দোকানটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার লাফ দিয়ে পড়তে ইচ্ছে করলো গাড়ি থেকে—মনে হ'লো অভিলাষের কবল থেকে আমাকে একমাত্র সে-ই বাঁচাতে পারে।

'রোক্কো। রোক্কো।' ক্যাঁচ ক'রে থেমে গেলো গাড়ি, লাফ দিয়ে নেমে ঠাশ ক'রে দরজাটা বন্ধ ক'রে অভিলাষ বললো, 'ওআন মোমেন্ট, প্লীজ—একটা সিগারেট কিনে আনি—' ওর কথা শেষ না-হ'তেই আমিও নেমে পড়লাম দরজা খুলে।

'এ কী, তুমিও নামলে?'

বললাম, 'দরকার আছে।'

'চলো তবে—' মুরুব্বির মতো এগিয়ে চললো আমাকে নিয়ে—যেন আমি এখনই ওর সম্পত্তি হ'য়ে গেছি।

দোকানে ঢুকেই সাহেবি ভঙ্গিতে ব'লে উঠলো 'হ্যালো—আরে শ্যামল, তুমি।'

সেই চেয়ারে ব'সে সেই টেবিলে মুখ নিচু ক'রে লিখতে-লিখতে সে চমকে চোখ তুলে তাকালো অভিলাষের দিকে, তারপর ত্রস্তে এগিয়ে এসে অভিলাষের করমর্দন ক'রে সহাস্যে বললো, 'বাঃ, অভিলাষ যে।'

'এই করছো আজকাল? বেশ, বেশ।'

ওস্তাদের মতো মুখভঙ্গি ক'রে অভিলাষ হাসলো। 'কী আর করা বলো? বাপের পয়সা যখন নেই—' অভিলাষের মুখ কঠিন হ'লো—সে-কথার জবাব না-দিয়ে লম্বা কাউণ্টরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে হেঁটে যেতে-যেতে বললে, 'একটু তোমার দোকানটা দেখি।'

'বেশ তো, ছাখো না।' ব'লে এইবার সে এগিয়ে এলো আমার দিকে। চোখে চোখ পড়তেই মাথা নিচু করলো। আশ্চর্য লাজুক মানুষ। অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললাম, 'আমার রুমাল?'

'দিচ্ছি—' নিজের টেবিলের কাছে গেলো—ঠিক যে-ক'টা আমি পছন্দ ক'রে গিয়েছিলাম—একটা ছোট্ট সোনালি বাক্সে ভরা সে-ক'টা রুমাল নিয়ে এলো টেবিল থেকে।

মৃদু হেসে বললাম, 'আলাদাই ছিলো দেখছি।'

মাথা নিচু ক'রেই বললো, 'তা ছিলো।'

'দিন—'

রুমালের বাক্সটা এগিয়ে ধরতেই অভিলাষ এদিকে এলো, 'কী নিচ্ছো?'

'ক'টা রুমাল।'

'দেখি কেমন—' বাক্সটা খুলে তচনচ ক'রে রুমাল দেখতে বললো, 'এ কী পছন্দ করেছো, রুনি—চলো, আমি রুমাল কিনে দেবো তোমাকে।'

আমি ওর এই ব্যবহারে ভয়ানক লজ্জা বোধ করতে লাগলাম—হঠাৎ ওর তচনচ-করা রুমালগুলো মুঠোতে তুলে বললাম, 'তোমার যা নেবার নিয়ে এসো, আমি গাড়িতে যাচ্ছি।'

কারো দিকে না-তাকিয়ে গাড়িতে এসে বসতে-না-বসতেই অভিলাষ সিগারেটের টিন হাতে ক'রে ফিরে এলো। গাড়ি ছাড়তেই গম্ভীর মুখে বললো, 'জেদ ক'রে তুমি রুমালগুলো আনলে, না?'

'জেদ আবার কী—তুমি জানো যে ওগুলো আমি নেবো ব'লে কথা দিয়েছি—সেখানে তোমার তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিটা না-করাই উচিত ছিলো।'

'তুমিই বা ও-সব ছাইভস্ম পছন্দ করবে কেন? ওগুলো রুমাল? ওগুলো ভদ্রলোকে ব্যবহার করে? আসলে ঐ ছোকরার সুন্দর মুখই তোমার পছন্দ হয়েছে, রুমালগুলো নয়।'

কথা কাটবার একেবারে প্রবৃত্তি ছিলো না, তবু বললাম, 'তা-ই যদি হয়, তাহ'লেই বা তোমার এত ঈর্ষা কেন?'

'ঈর্ষা?'—হেসে উঠলো অভিলাষ—'ঈর্ষা করবার যোগ্য পাত্রই বটে। 'কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে জিনিশ বিক্রি করছে

যে-লোকটা, তাকে ঈর্ষা করবে অভিলাষ দত্ত! রুনি, তোমার মাথা খারাপ।' জেদ চাপলো, বললাম, 'কাউণ্টরে দাঁড়িয়ে বিক্রি করতে পারে—কিন্তু তাই ব'লে তাকে গণ্য করবো না এত বেশি আত্মমর্যাদাও আমার নেই।'

'কবে থেকে?' শ্লেষের ধার দিয়ে ও যেন আমাকে কাটতে চাইলো। এবার আমি চুপ ক'রে গেলাম। কেননা, এখন এই মুহূর্তে যে-কোনো অশ্লীল কথাই অভিলাষের মুখ দিয়ে বেরতে পারে। ওর মন ছেলেবেলা থেকেই সন্দিগ্ধ—ওর বিলেত যাবার আগের একটা ঘটনা মনে পড়লো। আমার এক মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিলো। সে অঙ্কের ছাত্র ছিলো—আমাকে অঙ্ক কষাতে আসতো—এ নিয়ে অভিলাষ একদিন রাগ করলো। বললো, 'মেলামেশার একটা মাত্রাজ্ঞান থাকা দরকার, হ'লোই বা ভাই।'

আমি আকাশ থেকে পড়লাম—'বলছো কী তুমি বোকার মতো!'

'আমি এ-রকমই বলি—'

'তবে তো তোমারও একটু মাত্রাজ্ঞান দরকার ছিলো—' আমি হেসে কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু আমার চেষ্টায় ফল হ'লো না, বললো, 'তোমাদের মেয়েদের আবার বিশ্বাস! তোমরা সব পারো—ঐ এক অঙ্ক কষার অছিলায় রাত-দিন একসঙ্গে থাকবার কী হয়েছে।'

'তোমার মন ভয়ানক ছোটো।'

আমি উঠে গেলাম সেখান থেকে। একটু পরেই আমার সেই ভাই এলো—এবং সে এসেছে টের পেয়েই আমি তাকে ডেকে নিয়ে চ'লে এলাম নিজের ঘরে। তার ঠিক তিন দিন পরে সে আমাদের এখানে খেয়েছিলো এবং ফিরতে তার রাত হ'লো। ট্র্যামের জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন সে অপেক্ষা করছিলো তখন কে একজন ডেকে নিয়ে দূরে একটা অন্ধকার গলিতে তাকে এমন মার মেরেছিলো যে ঘণ্টাখানেক সে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে ছিলো সেখানে। জানি না কে করেছিলো, কেন করেছিলো—কিন্তু তবু অভিলাষকে জড়িয়ে একটা সাংঘাতিক ধারণা আমার মনের মধ্যে আজও বদ্ধমূল হ'য়ে আছে।

৩

একজন মানুষকে আর-একজন মানুষ কেন আকৃষ্ট করে, তার কোনো নির্দিষ্ট কারণ বার করা সহজ নয়। আমার মতো মেয়ের—যার বাপ মাসে দশ হাজার টাকা উপার্জন করে—যাকে বিয়ে করবার জন্য যুবক-মহলে উদ্যমের নিত্যনৈমিত্তিক প্রতিযোগিতা—বিশেষত যার ভাবী স্বামী একজন আই. সি. এস., তার পক্ষে একটা মনোহারী দোকানের একজন যুবককে দেখে হঠাৎ এমন ব্যাকুল হওয়া হয়তো নিতান্তই অস্বাভাবিক। কিন্তু যে-ব্যক্তিত্বের প্রখর ছাপ ওর চোখে-মুখে ছড়ানো

ছিলো—সমস্ত শরীরে সলজ্জ ভঙ্গিতে যে-অপূর্ব মাধুর্য ছিলো—তা আমি অস্বীকার করতে পারিনি, আমার মুগ্ধ মন আত্মচেতনা-বিমুখ হয়ে সর্বান্তঃকরণেই তা গ্রহণ করেছিলো। এত কথা এর আগে আমার মনে হয়নি—আমি বুদ্ধি দিয়ে কখনো বিশ্লেষণ ক'রে দেখিনি। হঠাৎ অভিলাষের ঈর্ষা-কাতর মন আমাকে এত সচেতন ক'রে তুললো যে মনের মধ্যে ভিড় ক'রে এলো কথার সমুদ্র।

অভিলাষ ব'সে-ব'সে গজরাতে লাগলো—বাঙালির শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে নানারকম মন্তব্য আওড়ালো। কিন্তু আমি নিশ্চুপ।

রাত্রিতে খেতে ব'সে অভিলাষ বাবাকে বললো, 'কাকাবাবু, আমি তো পরশুই যাচ্ছি; বাবাকে আপনি লিখুন—এ-মাসের মধ্যে যাতে বিয়ে হ'য়ে যায়। যে-কোনো এক শনি-রবিবারে ফেলবেন—আমি এসে রেজিস্ট্রি ক'রে যাবো।'

'রেজিস্ট্রি কেন?'—মা মুখ তুললেন অবাক হ'য়ে।

'আমার সময় কি এতই মূল্যহীন, কাকিমা, যে হিন্দু বিবাহের মতো একটা "সিলি" ব্যাপারে নষ্ট করা যায়?'

মা আহত হ'য়ে বললেন, 'আমাদের তো একটা সংস্কার আছে, এত কাল ধ'রে যে-প্রথা এত আনন্দের মনে হয়েছে তা চট ক'রে উচ্ছেদ করা—বিশেষত আমার একটিমাত্র মেয়ের বেলায়—'

বাবা ধমকে উঠলেন—'তোমাদের স্ত্রীলোকের বুদ্ধি রাখো। যত সব বাজে—'

বাবা একবারে অভিলাষের ছায়া। পাছে অভিলাষ রুষ্ট হয় এই ভয়ে তিনি সর্বদাই আড়ষ্ট। অভিলাষের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি ঠিক বলেছ অভি—ও-সবের কোনো মানে হয় না।'

'আপনি নোটিস দিয়ে রাখবেন আপিশে—আমি দেখুন পরশু যাচ্ছি—পরশু হোলো বেস্পতিবার, তার পরে গেল এক শনি—তার পরের শনিবারই আমি এখানে চ'লে আসবো তাহ'লে।' আমি লক্ষ্য করলুম, এ-কথা বলতে-বলতে অভিলাষ আড়চোখে আমার দিকে তাকালো।

তার পরের দিন সকালে অভিলাষ চা খেয়েই কোথায় বেরিয়ে গেলো, এলো অনেক বেলায়। ভালো ক'রে দেখা হ'লো সেই বিকেলের চায়ে। চা খেতে-খেতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আজ যাবে নাকি বেড়াতে ?'

'না।'

'কেন ?'—মা খাবার দিচ্ছিলেন, কী মনে ক'রে একটা কাজের অছিলায় বেরিয়ে গেলেন। মা যেতেই আভিলাষ কাছে এসে বসলো। বললো, 'রাগ করেছো নাকি আমার উপর ?'

'বাঃ, রাগ করবো কেন ?'—ওর আবেগকে হালকা ক'রে দেবার চেষ্টা করলাম।

'রাগ না-করলে কেউ এ-রকম ক'রে থাকে ?'

আমার হাঁটুর উপর হাত রাখলো। গায়ে হাত না-দিয়ে ও কথাই বলতে পারে না।

বাধা দিলাম না—এ-বাড়িতে আমার উপর ওর অবাধ স্বাধীনতা—আমি ওর ভাবী স্ত্রী। কিন্তু মুখের চেহারা আমার বদলে গেলো, তক্ষুনি হাসতে চেষ্টা ক'রে বললাম, 'পাগল! তোমার উপর কি রাগ করতে আছে ?'

'তবে চলো বেড়াতে—যদি বেড়াতে যাও তবে বুঝবো রাগ করোনি।'

বুঝলাম অভিলাষের মস্তিষ্কে কিছু বিকৃতি হয়েছে। কালকের ব্যাপারে ওর লোভ প্রশ্রয় পেয়ে একেবারে চরমে উঠেছে। শক্ত হ'য়ে বললাম, 'রাগ অভিমানের কথা নয়, অভিলাষ, আজকে আমার একজনদের বাড়ি না-গেলেই নয়।'

হঠাৎ বাবা ঘরে ঢুকলেন—এ-সময় তিনি আমাদের সঙ্গে চা খান না—খান না তার কারণ অবিশ্যি এ-সময় তিনি কোর্ট থেকেই ফেরেন না। আজ সকাল-সকাল ফিরেছেন। ঘরে ঢুকেই অভিলাষকে প্রায় আমার গায়ের সঙ্গে লেগে কথা বলতে দেখে একটু অপ্রস্তুত হলেন—অভিলাষ সপ্রতিভভাবে বললো, 'আজ খুব শিগগির ফিরেছেন দেখছি।'

'হ্যাঁ, তাড়াতাড়িই কাজ হ'য়ে গেলো—তোমার মা কোথায়, রুনি ?'

'কী যেন, দেখি—' এই অছিলায় আমি চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালা —কিন্তু মা তক্ষুনি ঘরে এলেন—আমি হতাশ হ'য়ে একটু দাঁড়িয়ে থেকে বললাম, 'মা, আজ আমি একবার অঞ্জলিদের বাড়ি যাবো।'

'অঞ্জলিদের বাড়ি? কেন?'—বাবা প্রশ্ন করলেন।

আমি বললাম, 'দরকার আছে।'

'কী যে তোদের দরকার। না, না, সন্ধেবেলা কোথাও কোনো বাড়িতে আটকে থাকা আমি ভালোবাসি না। অভি আজ যাচ্ছো না বেড়াতে?'

'আমি তো সেধে-সেধে হয়রান হ'য়ে গেলুম, কাকাবাবু।'

আমার মনের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। বিদ্রোহ করা উচিত ছিলো। আমি জানি, অভিলাষের আজ আর মাত্রাজ্ঞান থাকবে না। মনে হ'লো কালকের ইতরামির কথা সব ব'লে ফেলি—কিন্তু মুখেও বাধলো—আর বললেও এটা তাঁরা ইতরামি হিশেবেই নেবেন কিনা সন্দেহ। ভেবে উঠতে পারলাম না, কী করি।

অভিলাষ বললো, 'যাও, চান-টান ক'রে প্রস্তুত হ'য়ে নাও গে।'

বাধ্য মেয়ের মতো উঠে গেলুম, স্নানও করলুম, তারপর স্নান ক'রে এসে ভাবতে লাগলুম কী করি। মনে হ'লো মাকে খুলে বলি—কিন্তু বলি-বলি ক'রেও কিছুতেই তাঁকে বলতে পারলুম না। চুপ ক'রে শুয়ে রইলাম বিছানায়।

কালকের মতো আবার অভিলাষের গলা পেলাম, 'তোমার হ'লো ?'

জবাব দিলাম না।

'রুনি—ও রুনি !' আমি চুপ।

কিন্তু অভিলাষের আস্পর্ধার তো সীমা নেই, পরদা সরিয়ে সে মুখ বার ক'রে অবাক হ'য়ে বললো, 'এ কী, কাপড় পরোনি, শুয়ে আছো যে ?'

শুয়ে থেকেই কাতর গলায় বললাম, 'অভিলাষ, মাকে একটু পাঠিয়ে দিতো পারো ? বাথরুমে প'ড়ে গিয়ে ভয়ানক লেগেছে, দাঁড়াতে পারছি না।'

'প'ড়ে গেছো ? মাই গুডনেস !'—লাফ দিয়ে সে ঘরে ঢুকলো—'কোথায়, কোথায় লেগেছে—' ডাক্তারের মতো সে প্রশ্নের সঙ্গে-সঙ্গে হাতে মাথায় টিপে-টিপে স্থান নির্দেশ করবার চেষ্টা করতে লাগলো।

অস্বস্তিতে উদ্বেগে আমি ঘেমে উঠলুম—জোরে-জোরে ছোটো ভাইয়ের নাম ধ'রে নিজেই ডাকবার চেষ্টা করলুম। অভিলাষ বললো, 'ওকে ডাকছো কেন---আমিই তো আছি। আমাকে তোমার বিশ্বাস হয় না ?'

'না।'

অভিলাষ হাসলো।—'বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথাই আর ওঠে না, রুনি—কেননা, তুমি তো আমার স্ত্রী।'—মুখ নিচু

করলো আমার মুখের উপর। ওর উদ্দামতায় আমার গলার স্বর অস্ফুট হ'য়ে কোথায় মিলিয়ে গেলো, আমি ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। মনে হ'লো, সমস্ত শরীরটা আমার কুকুরে চেটে দিয়েছে—ঘৃণায় লজ্জায় শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে ওকে ঠেলে চ'লে এলাম বাইরে। সোজা একেবারে নিচে খাবার ঘরে এসে দাঁড়াতেই আমার উসকো-খুসকো চুল আর মুখের চেহারা দেখে মা উদ্বিগ্ন হ'য়ে বললেন, 'এ কী রে—তোর চেহারা এমন দেখাচ্ছে কেন?'—বাবাও তাকালেন—'সত্যিই তো! কী হয়েছে রে?

বলতে পারলাম না, গলা বুজে গেলো। অভিলাষ আশ্চর্য ছেলে! তক্ষুনি নেমে এসেছে নিচে। ব্যস্ত হ'য়ে বললো, 'কাকিমা, ও ভয়ানক আছাড় খেয়েছে—কোথায় চোট লেগেছে দেখুন তো!' মুখের চেহারা সাংঘাতিক উদ্বিগ্ন ক'রে ও দাঁড়িয়ে রইলো।

মা বাবা এবার ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন—এলো জামবাক, ঠাণ্ডা জল, গরম জল—শুইয়ে দেয়া হ'লো বিছানায়। এত সব ক'রে অভিলাষ একাই বেরিয়ে গেলো শেষে। পরের দিন ও চ'লে গেলো, গেলো দুপুরের দিকে। বাবার আদেশ-মতো আমি ওকে সী-অফ করতে গিয়েছিলাম—ফেরবার পথে মনোহারি দোকানে না-গিয়ে কিছুতেই পারলাম না। যাবো কি যাবো না—যাবো কি যাবো না—এ-কথা যে কত লক্ষবার চিন্তা

করেছি তা গুনলে বোধ হয় সংখ্যায় কুলোতো না। অভিলাষকে স্টেশনে পৌঁছতে যাবার সময় থেকেই আমার মন ঐ এক চিন্তাতেই ভ'রে ছিলো। বলামাত্রই যে ওকে তুলে দিতে যেতে চাইলাম স্টেশনে—তার মূল কারণই বোধহয় ঐ দোকান। এত ভেবে-ভেবে হঠাৎ ঠিক করলাম—আমার যাওয়া একান্ত দরকার—কালকের রুমালের দামই যে বাকি রয়েছে। কিন্তু এও মনে হ'লো আজ আরেক বিষ্যুৎবার—বেচা-কেনা বন্ধ—তা হোক—অত্যন্ত শঙ্কিত পায়ে দোকানে ঢুকলাম—এত লজ্জা আর কখনো কোনো কারণেই আমি বোধ করিনি এর আগে। অপরাধীর মতো নিঃশব্দে গিয়ে কাউণ্টরে হাত রেখে দাঁড়ালাম। নিবিষ্ট হ'য়ে বই পড়ছিলো, পড়তে-পড়তে হঠাৎ সে চোখ তুলে তাকালো—'এসেছেন ?' আমাকে দেখতে পেয়ে এমন সাগ্রহে কথাটা বললো যে এতক্ষণ যেন সে এই প্রতীক্ষাই করছিলো।

উঠে এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়ালো। আমি ব্যাগ থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে বললুম, 'কাল তাড়াতাড়িতে রুমালের দামটা—'

'আজ আরেক বিষ্যুৎবার যে—' মৃদু-মধুর হেসে সে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে।

'বিষ্যুৎবারে তো আর বিক্রি করছেন না,—' আমি বললাম, 'দামটাই নিচ্ছেন।'

'ও একই কথা—কিন্তু আপনি বসুন।'—হঠাৎ ও ব্যস্ত হ'য়ে

উঠলো বসতে দেবার জন্য। আমি গম্ভীর হ'য়ে বললাম, 'কেন, আমি কি বসতে এসেছি?'

'না, বসতে আপনি আসেননি—আর বসতে দেবার যোগ্যই নাকি আমি? কী আশ্চর্য! কিন্তু অভিলাষ আমার বাল্যবন্ধু কিনা, তার স্ত্রীকে—'

'স্ত্রী!—আপনি এ-সব কোথায় শুনলেন?'

'কেন, অভিলাষ কাল যে এসেছিলো আপনি তা জানেন না?' তারপর একটু হেসে বললে, 'রুমালের দামও সে দিয়ে গেছে।'

আমার মুখ লাল হ'য়ে উঠলো।

হঠাৎ ঘরের ডানদিকের একটা দরজা খুলে এক বিধবা ভদ্রমহিলা মুখ বাড়িয়ে ডাকলেন, 'খোকা,' পরমুহূর্তেই আমাকে দেখে থমকে গেলেন।

'মা, এসো—ইনি আমাদের অভিলাষের স্ত্রী—মানে অভিলাষের সঙ্গে এঁর বিয়ে হচ্ছে।'

'অভিলাষ?' ভদ্রমহিলা কপাল কুঁচকোলেন মনে করবার জন্য।

ও বললো, 'গোপাল দত্ত-রায়ের ছেলে অভিলাষ—ভুলে গেলে?'

'ও—' ভদ্রমহিলার মুখ একটু যেন কঠিন হ'লো—কিন্তু তখুনি সামলে নিয়ে বললেন, 'বাঃ, বেশ তো বৌ।'

'ওঁকে বসতে দাও—দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি।'

'না, না—' আমি ব্যস্তভাবে বললাম, 'আমাকে এখুনি যেতে হবে।'

'বাঃ, তা কি হয়—একটু এসো।' ওঁর মা এগিয়ে এলেন—দোকানেরই পিছনে ছোট্ট ফ্ল্যাট—সুন্দর দক্ষিণ খোলা—ঝকঝকে ঘর দুটো। ঘর-সংলগ্ন খোলা বারান্দা—আর বারান্দার অর্ধেক জুড়ে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড প্যাকিং কেসে মাটি ফেলে চমৎকার বাগান করা। হঠাৎ এমন ভালো লেগে গেলো যে আমাদের বিরাট তেতলা রাজপ্রাসাদেও এর আস্বাদ কখনো পেয়েছি মনে হ'লো না।

আমাকে যে-ঘরে বসালেন—ভদ্রলোকের ঘর বোধ হয় সেখানা। মাঝখানে ছোট্ট লোহার খাট পাতা—চার পাশে মোটা-মোটা অসংখ্য বইয়ের সারি। কোণের দিকে লম্বা একটা হেলানো কাউচ—আর পাশে ছোটো একটা দাঁড়ানো আলো, তার পাশেই টেবিল-ফ্যান। বুঝলাম, আসল আস্তানা এই কাউচখানাই। ভদ্রমহিলা বললেন, 'একটু বোসো, মা—আমি আসছি। খোকা, একটু কথা বল।' ঘর ঠাণ্ডা করবার জন্য বোধ হয় সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ ছিল—আবছা-আবছা আলো-ভরা ঘর—ওর সঙ্গে একা ব'সে থাকতে হঠাৎ যেন কেমন লাগলো। দোকানে আসি—অছিলাই হোক যা-ই হোক—একটা উপলক্ষ্যের সেতু সর্বদাই থাকে আমাদের

মাঝখানে। মুখ তুলে তাকাতেও সংকোচ বোধ করছিলাম। একটু পরে বললেন, 'আপনাদের বিয়ে কবে হচ্ছে?'

'আমি কী জানি।'

'বাঃ, আপনি না-জানলে জানবে কে।'

'জানতাম, যদি বিয়ে হ'তো।'

'সে কী—বিয়ে তাহ'লে আপনাদের হচ্ছে না?'

বললাম, 'না'—কেমন ক'রে বললাম, কেন বললাম জানি না, কিন্তু সেই মুহূর্তে এ-কথা ছাড়া অন্য জবাব মুখে এলো না। আমার মুখের দিকে সে এবার অনেকক্ষণ অপলকে তাকিয়ে রইলো—তারপর হঠাৎ উঠে বললো, 'একটা জানালা খুলে দি, বড়ো অন্ধকার।'

এবার ঘরে ওর মা এলেন। তাঁর হাতে একখানা পাথরের থালা ভরা একরাশ ফল আর সন্দেশ।

বললেন, 'খোকা, ঐ টেবিলটা দে তো কাছে।'

আমি এমন অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগলাম! কিসে থেকে কী হ'লো। বললাম, 'এ আপনি কী করেছেন—আমি দেখুন কিছু খাবো না—' 'খাবে বইকি—আহা ছেলেমানুষ—আমি জল নিয়ে আসছি।' উনি জল আনতে যেতেই আমি ওঁকে বললাম, 'এ ভারি অন্যায়।' হেসে বললে, 'অন্যায় তো আমি করিনি—মাকে বলুন।' 'আপনারই দোষ, আপনি ছাড়া কখনোই এ-রকম হ'তো না।' 'তা না-হয় হ'লোই একটু।'

মৃদু হেসে ও তাকালো আমার দিকে। আমি জবাব দেবার আগেই ওর মা জল নিয়ে ফিরে এলেন।

'যা হয় একটু মুখে দাও, মা—' ভদ্রমহিলা আঁচলে মুখ মুছে আমার পাশে বসলেন।

আমাকে খেতেই হ'লো শেষে। হাত-ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলুম, পুরো এক ঘণ্টা এখানে কাটিয়েছি, লজ্জিতভাবে উঠে প'ড়ে বললুম, 'ভয়ানক দেরি হ'য়ে গেলো—আজ আসি।' নিচু হ'য়ে প্রণাম করলুম ওঁর মাকে। বিদায় দেবার সময় ভদ্রমহিলা অতিশয় স্নেহভরে আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'আবার এসো, মা।'

'নিশ্চয়ই আসবো। আপনিও তো একদিন আসতে পারেন আমাদের ওখানে। আসবেন?'

'মা? যাবেন?' ভদ্রলোক এমন অবজ্ঞাভরে হাসলেন যে হঠাৎ আমার মেজাজ খারাপ হ'য়ে গেলো। বিরূপ চোখে তাকালাম একবার মুখের দিকে। গাড়িতে তুলে দিতে এসে ভদ্রলোক বললেন, 'রাগ করেছেন নাকি?'

'কেন?'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে।'

'মনে যদি হয়ই, তবে করেছি।'

'কী আশ্চর্য! আমার মতো অধমকে আপনি এতটা সম্মান দেবেন নাকি? অভিলাষ যদি—

'অভিলাষের কথা অভিলাষকে বলবেন,' আমি গাড়িতে উঠে বসলুম।

গাড়ি যখন স্টার্ট দিয়েছে—তখন একেবারে ভিতরের দিকে মুখ এনে বললো, 'আবার আসবেন।'

এমন অদ্ভুত অস্পষ্ট স্বরে কথাটা বললো যে আমি আশ্চর্য হ'য়ে তাকালাম মুখের দিকে। চোখে চোখ পড়লো—আর আমার বুকের মধ্যে শিরশির ক'রে উঠলো।

বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছিলো দেখে এদিকে মা খুব ভাবছিলেন হয়তো, আমি আসতেই বললেন, 'এই যে, রুনি! কী রে, এত দেরি হ'লো যে?'

বলতে যাচ্ছিলাম, নির্দিষ্ট ট্রেন অভিলাষ ফেল করেছিলো ব'লে ব'সে থাকতে হয়েছিলো, কিন্তু মা-র মুখোমুখি এই প্রথমবার এত বড়ো মিথ্যেটা হঠাৎ কিছুতেই বার করতে পারলাম না। বললাম, 'ফেরবার পথে এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম।'

মা চোখ তুলে বললেন, 'কার বাড়ি রে? অঞ্জলি?'

'না, মা—তুমি চিনবে না তাদের।'

'না, চিনবো না—' অবিশ্বাসের হাসিতে মার মুখ ভ'রে গেলো, 'তুই চিনিস আর আমি চিনবো না!'

এবার আমি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বসলাম এসে মা-র খাটে। আমি যে একান্তই গোপনে এই মেশামেশিটা চালাচ্ছিলাম সে-কথাটা বুকের মধ্যে আমার পাথর হ'য়ে চেপে ছিলো।

এ-সুযোগটা আমি নিলাম। সহজ হবার চেষ্টা ক'রে বললাম, 'আমার সঙ্গে একজনদের আলাপ হয়েছে, মা। ভারি চমৎকার লোক।'

মা বললেন, 'কারা?'

'অভিলাষের চেনা—' এটুকু ব'লে আমি মা-র মনটা একটু তৈরি করবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু মা যত উৎসাহিত হবেন ভেবেছিলাম তা তিনি হলেন না, অতিশয় উদাস ভঙ্গিতে বললেন, 'নাম কী মেয়েটির?'

এর উত্তর দিতে গিয়ে আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম। কুণ্ঠিতভাবে বললাম, 'মেয়ে নন তিনি। তিনি অভিলাষের ছেলেবেলাকার বন্ধু। নাম বোধহয় শ্যামল।' মা-র দিকে চেয়ে দেখলাম, তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। মনে হ'লো, বুকের মধ্যে যত ভয় যত শঙ্কা সব যেন তিনি জেনে ফেলেছেন। এবার কনুইতে ভর দিয়ে মাথা তুলে বললেন, 'কেন গিয়েছিলে সেখানে—অভিলাষ কিছু জানাতে বলেছিলো?'

ঢোঁক গিলে বললাম, 'না।'

'তবে?'

'এমনিই।'

'আরো গিয়েছো নাকি কখনো?' মা-র গলার স্বরে একটু কাঠিন্যের আভাস পেলাম। অস্ফুটে বললাম, 'গিয়েছি।'

'কে আছে তাদের বাড়ি ?'

'তাঁর মা।'

'হুঁ—' মা কনুইয়ের ভর থেকে মাথা নামিয়ে শুলেন।

আমি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'ওঁদের মনোহারি দোকান কিনা—মাঝে-মাঝে জিনিশ কিনতে গিয়েই দেখা হয়েছে।'

হেসে বললেন, 'দোকানিদের সঙ্গে আবার বন্ধুতা কী রে ?'

হঠাৎ আমি উত্তেজিত বোধ করলাম এ-কথায়। মা-র অবজ্ঞা আমাকে আঘাত দিলো। তাঁর উজ্জ্বল অদ্ভুত দুই চোখ আমি দেখতে পেলাম কাছে। বললাম, 'কেন, আই. সি. এস. ছাড়া বুঝি তোমাদের মানুষকে মানুষ জ্ঞান হয় না ?'

আমার উত্তেজনায় মা অবাক হলেন কিনা জানি না। কিন্তু শান্তভাবে বললেন, 'তা তোদের কাছ থেকেই তো এ-ধারণা আমার বদ্ধমূল হয়েছে।'

'তোদের মানে ? আমার কাছ থেকে কখনোই না।'

'তোর আবার মত কী, ইচ্ছে কী, তুই তো তোর বাবারই ছায়া।'

'কক্ষনো না—' কথাটায় গলার স্বর এত চ'ড়ে গেলো যে নিজের কানেই অদ্ভুত লাগলো। লজ্জিত হলাম।

মা বললেন, 'আজ বোধহয় অভিলাষের বন্ধু ব'লেই তুই তাকে একজন মানুষ ব'লে গণ্য করছিস।'

আমি জবাব দিলাম না। অভিলাষ, অভিলাষ, অভিলাষ। এদের মন অভিলাষেই আচ্ছন্ন। রাগ ক'রে উঠে আসছিলাম, মা ডাকলেন, 'শোন—'

থমকে দাঁড়াতেই বললেন, 'ছাখ রুনি, আজ সকালবেলা অভিলাষ বেরিয়ে যাবার আগে আমাকে বলেছিলো চৌরাস্তার মোড়ে না কোথায় এক মনোহারি দোকান আছে, তুই মাঝে-মাঝে সেখানে যাস। ওর ইচ্ছে—'

'কী ওঁর ইচ্ছে?' সম্পূর্ণ না-শুনেই আমি ঝাঁঝ দিয়ে উঠলাম। 'ছাখো মা, সবটারই একটা সীমা থাকা দরকার। অভিলাষ আমাকে সব নিয়েই শাসন করবে আর তোমরাও সঙ্গে-সঙ্গে তার প্রশ্রয় দেবে—'

'তা তো দেবোই—' হঠাৎ মা উঠে বসলেন বিছানার উপর, রাগ ক'রে বললেন, 'অভিলাষের সঙ্গে তোমার যে-সম্বন্ধ তাতে তার কথা মান্য করতেই আমি তোমাকে শেখাবো। তোমাদের আজকালকার রীতিই এই—স্বামীকে অবহেলা ক'রে নিজের আমিত্বের জাহির। খাবার পরবার বেলা তো সেই মানুষই নির্ভর।'

'তবে তুমি কী বলতে চাও আমাকে?'

'বলতে চাই অভিলাষকে তুমি মান্য করবে। আমি লক্ষ্য করেছি, তোমার বাবার শিক্ষায় মানুষ হ'য়ে তুমি অত্যন্ত উদ্ধত হয়েছো।'

'আমি এর চেয়ে বেশি মান্য করতে জানি না।'

'তা না-জানলে অভিলাষ তোমাকে বিয়ে করবে না।'

'ব'য়ে গেছে—'আমি সবেগে উঠে দাঁড়ালাম; বললাম, 'ভেবেছো কী তোমরা আমাকে, আমি কেবল বিয়ের জন্যে ওর পদলেহন করতে থাকবো? আমার প্রাণ নাই, আমার আত্মা নেই?'

'না, নেই। এ-সব ক্ষেত্রে মেয়েদের আলাদা অস্তিত্ব থাকলে তাতে সর্বনাশ ঘটে। এখন তুমি যাও।' গম্ভীরভাবে আদেশ ক'রে মা ফিরে শুলেন। রাগে দুঃখে সমস্ত শরীরে যেন আগুন ধ'রে গেলো আমার। গুম হ'য়ে ব'সে থেকে উঠে এলাম।

পরের দিন কোর্টে যাবার মুখে বাবা আমাকে ডাকলেন। আমি যেতেই তিনি বললেন, 'অভিলাষ ব'লে গেছে রেজিস্ট্রি অফিসে একটা নোটিস দিয়ে রাখতে। খুব সম্ভব এ-রোববারের পরের রোববার ও আবার আসবে—তোমার মত তো আমি আমি জানিই, তবুও কথাটা ব'লে গেলাম।'

আমার মুখ নীল হ'য়ে গেলো। অভিলাষের খপ্পরে একবার যদি পড়ি, কী উপায় হবে আমার। ওর সন্দেহাচ্ছন্ন ইতর মনের পরিচয় আমি কেমন ক'রে মা-বাবাকে বোঝাবো। অভিলাষ আই. সি. এস.—এর উপরে আর কথা নেই। সমস্ত শরীরকে শক্ত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম বাবার কাছে। বাবা একটুক্ষণ

অপেক্ষা ক'রে বেরিয়ে গেলেন। বুঝে গেলেন আমার সম্মতিরই আভাস এটা। এর পরের হু'দিন আমি কোথাও বেরুলাম না—ভালো ক'রে কথা বললাম না কারো সঙ্গে—মনের মধ্যে প্রচণ্ড অশান্তির আগুনে পুড়তে লাগলাম একা-একা।

বোঝালাম মনকে—অভিলাষকে গ্রহণ করবার সমস্ত যুক্তি মেলাতে লাগলাম আপন মনের মধ্যে, কিন্তু ভুলতে পারলাম না ওর কথা। সামান্ত মনোহারি দোকানের স্নুদর্শন অধিকারী আমার সমস্ত হৃদয়-মন জুড়ে রইলো। আমার বাবা লক্ষপতি—রাজকন্যা আমি—আমার আত্মমর্যাদার পক্ষে এর চেয়ে অপমান আর কী আছে। কিন্তু হার মানলাম হৃদয়ের কাছে। সমস্ত যুক্তিতর্কের অতীত হ'য়ে হুই চোখ জলে ভ'রে গেলো।

এর তিনদিন পরে সকালবেলা চা খেতে ব'সে বাবা বললেন, 'রুনি, আজ সিনেমা দেখতে যাবি নাকি ? খুব ভালো একটা হিন্দি ছবি হচ্ছে প্যারাডাইসে, তুই তো হিন্দি ছবির গান শুনতে চেয়েছিলি।'

'যেতে পারি।'

'উৎসাহ নেই যে বড়ো ?'

ছোটো ভাই মণ্টু লাফিয়ে উঠলো ও-পাশ থেকে, 'ও বাবা, আমি যাবো।'

'যাবি তো যাবি, অস্থির হচ্ছিস কেন ? তুই যাবি নাকি রে ?' বাবা জিজ্ঞাস্নু দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে।

মা বললেন 'আমি তো আজ শ্যামবাজার যাবো ছোড়দির ওখানে।'

'আমি তো যাবো না',—আমি বললাম—'আমি আর মণ্টু দুপুরের শো-তে সিনেমাতেই যাবো।' বোঝা গেলো, মা বেশি খুশি হলেন না—তাঁর ভাব-স্বভাব খানিকটা সেকেলে।—বাবা আবার আজকাল আধুনিক হয়েছেন—দু'দিন পরে আই. সি. এস.-এর স্ত্রী হবো অথচ একা-একা একটা সিনেমা পর্যন্ত দেখবো না, এ-বদনাম ঘোচাবার জন্যেই বোধহয় তাঁর এই উদ্যম।

কিন্তু সে যা-ই হোক, বাড়ি থেকে-থেকে আমার যে হাঁপ ধরেছিলো তা থেকে তো খানিকটা বাঁচবো। মনে-মনে কেমন-একটা আরাম হ'লো।

মণ্টু পারলে বারোটার সময় গিয়েই ব'সে থাকে, এমন অবস্থা। বাবা কোর্টে গেলেন, মাকেও সেই গাড়িতে পৌঁছে দিতে নিয়ে গেলেন। এবার আমার মনের মধ্যে এক অদম্য ইচ্ছার সাড়া পেলাম। এখনকার মতো তো আমি স্বাধীন—এখন কি আমি যেতে পারি না ইচ্ছে করলে? আজ দোকান ছুটি—আজ বিষ্যুৎবার। বিদ্যুতের মতো বুকের মধ্যে চমকাতে লাগলো—একটি কালো পরদা-ফেলা ঠাণ্ডা ঘর, কোণে একটি টেবিল, আর চেয়ারে ব'সে অপেক্ষমান একজন।—কিন্তু সত্যিই কি সে অপেক্ষা করছে?—কী আশ্চর্য আমাদের মন।

যাকে চাই, স্বতঃই কেন এ-কথা ধ'রে নিই যে অন্য পক্ষও সেই তীব্রতা নিয়েই আমাকে প্রার্থনা করছে।

আপন মনই কেন অন্যের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় বার-বার?—আমি অভিলাষের স্ত্রী—ওঁর কাছে আমার সেই তো পরিচয়। মনকে প্রশ্রয় না-দিয়ে স্নান করতে ঢুকলাম গিয়ে বাথরুমে। বেরিয়ে দেখি মণ্টুর অসাধারণ তাড়া। ইতি-মধ্যেই সে স্নান ক'রে খেয়ে হাফপ্যান্টের উপরে বেল্ট কষতে লেগে গেছে, আর বারে-বারেই উঁকি দিয়ে দেখছে গাড়ি কেন ফিরে আসছে না মাকে রেখে—আমাকে দেখেই ব্যস্ত হ'য়ে বললো, 'ও মা—তুমি মাত্র চান ক'রে এলে? কী হবে?'

হেসে বললাম, 'আজ আর আমাদের সময় নেই যাবার।'

'ঈশ!'

'ঈশ কী—ছ্যাখ না ঘড়িতে কত বেজে গেলো—তার উপর ঘড়িটা স্লো, অথচ এখনো মোটে গাড়িই ফিরলো না।'

মণ্টু বিষণ্ণ হ'য়ে গেলো। তক্ষুনি হেসে বললো, 'দুষ্টুমি, না? দাঁড়াও, আমি নিচের বড়ো ঘড়িটা দেখে আসি।' ছুটলো সে ঘড়ি দেখতে।

আমার নিজেরও বাড়ি থেকে বেরুবার গরজ মন্দ ছিলো না। নিজের মনকে আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না—প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিলো, ইচ্ছাকে এ-ভাবে দমন করবার অধিকার আমার নেই—আমি যাবো, আমার যাওয়া উচিত।

তিনটার সময় শো—রওনা হলাম আড়াইটারও আগে। রাসবিহারী এভিনিউ ছাড়িয়ে রসা রোডে পড়তেই আমার চোখ থমকে গেলো। দেখলাম, ট্র্যামের অপেক্ষায় সে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। নিজের অজান্তেই আমি গাড়ি ঘোরাতে আদেশ দিলাম—নির্দেশমতো তার সামনে এসে গাড়ি ঘ্যাঁচ ক'রে থেমে গেলো। 'আপনি!' আমার মুখের দিকে সে অবাক হ'য়ে তাকালো। হঠাৎ লজ্জায় আমার সমস্ত মুখ যেন গরম হ'য়ে গেলো—এমন-কোনো ঘনিষ্ঠতা ওর সঙ্গে আমার নেই যাতে গাড়ি থামিয়ে দেখা করা যায়। কথার জবাব দিতে পারলাম না—চোখও তুলতে পারলাম না। ও এগিয়ে এসে গাড়ির দরজা ধ'রে দাঁড়িয়ে বললো, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'সিনেমায়।'

'তাই নাকি? আমিও যাচ্ছি।'

বুকের রক্ত তোলপাড় ক'রে উঠলো, তবু বললুম, 'তবে তো একই পথ আশা করি—অন্তত চৌরঙ্গি পর্যন্ত।'

'তা তো নিশ্চয়ই—কিন্তু ঐ যে আমার ট্র্যাম যায়—'

'যাক—আপনি গাড়িতে আসুন।'

'গাড়িতে?'—লজ্জিত মুখে সে ইতস্তত করতে লাগলো। আমি দরজা খুলে ডাকলুম, 'আসুন।'

'আপনার আদেশ শিরোধার্য।' মধুর হেসে সে এ-দিকের দরজা বন্ধ ক'রে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসলো।

মুহূর্তে বিগড়ে গেলো আমার মন। বাবুর এখানে বসা হ'লো না—ড্রাইভারের পাশে না-বসলে ওঁকে মানাবে কেন? হাজার হোক, দোকানদার তো! গুম হ'য়ে ব'সে রইলুম বাইরের দিকে তাকিয়ে। মণ্টু ফিশফিশিয়ে জিগেস করলো, 'কে, দিদি?'

'তা দিয়ে তোর দরকার কী।'

'খুব সুন্দর, না?'

'তোর মতোই।'

'বড়ো হ'য়ে আমি ও-রকমই হবো, দেখো।'

ওদিক থেকে সে মুখ ঘোরালো—'এটি আপনার ভাই নিশ্চয়ই।'

'হুঁ।'

'আশ্চর্য মিল কিন্তু।'

'সেটাই তো স্বাভাবিক।'

এতক্ষণে সে আমার গম্ভীর মুখ লক্ষ্য করলো বোধ হয়। একটু তাকিয়ে থেকে ফিরে বসলো চুপ ক'রে। একটু পরেই দেখলুম, ড্রাইভারের সঙ্গে তার আসন বদল হচ্ছে। স্টিয়ারিং হুইল ধরতেই আমি অবাক হ'য়ে বললুম, 'এ কী!'

'হাত নিশপিশ করছে বড়ো।'

'না, না, ও আপনি ছেড়ে দিন ওর হাতেই।'

মুখ না-ঘুরিয়েই বললো, 'কিচ্ছু ভয় নেই আপনার।'

'না, না, আমার কথা শুনুন আপনি।'

'আপনি বললে শুনতেই হবে—' চকিতে মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলো—কিন্তু গাড়িটা তেমনিই চলতে লাগলো আশুতোষ মুখার্জি রোড দিয়ে।

একটু পরে আবার চকিতের জন্য মুখ ঘুরিয়ে বললো, 'অপরাধ নেবেন না।' না-ব'লে পারলুম না, 'নিলেও যে আপনি কথা শুনবেন তার তো কোনো লক্ষণ দেখছিনে। আমি কি আপনাকে গাড়ি চালাবার জন্যে ডেকেছিলাম—' শেষের কথাটায় আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও অভিমানটা একটু প্রকাশ হ'য়ে পড়লো। নিমেষে আবার বদল হ'লো আসন—ড্রাইভারের হাতে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি মুখ ঘুরিয়ে বসলো সত্যিই।

'আমার নিজেরও তা-ই মনে হচ্ছিলো এখন।'

'তবু ভাগ্যি।'

'ভাগ্যি আর আপনার নয়—যে-অভাগা সমস্তটা সকাল আর দুপুর প্রতিটি মুহূর্ত প্রতীক্ষায় ব্যর্থ হ'য়েও শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়েছে তার মতো ভাগ্যবান অন্তত এই মুহূর্তে তো আর-কেউ নয়।' কথাটা ঠাট্টা ক'রে বলতে গিয়েও সুরটা যেন ওর গভীর হ'য়ে গেলো হঠাৎ। অভিলাষ ওর বন্ধু—আর আমি অভিলাষের স্ত্রী, এই অছিলার সেতু মাঝখানে রেখেই ও আমাকে এত বড়ো ঠাট্টাটা করতে পেরেছিলো, কিন্তু এ-কথা যে একান্তই ওর মনের কথা, এটা বুঝতে আমার সময় লাগলো না।

চোখ তুলে তাকালুম—মোটা পুরু কাচের আবরণ ভেদ ক'রেও ওর চোখের ভাষা আমাকে রোমাঞ্চিত করলো।

কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলুম জানি না, হঠাৎ সচকিত হ'য়ে দু'জনেই একসঙ্গে চোখ নামিয়ে নিলুম।

এর পরে অনেক্ষণ আর কথা বলতে পারলুম না। গাড়ি চৌরঙ্গিতে আসতে ও বললো, 'আপনারা কোথায় যাচ্ছেন আমি তো তা জানিনে—আমি লাইটহাউসে যাবো।'

মণ্টু এতক্ষণে সুযোগ পেলো কথা বলবার, সগৌরবে বললো, 'আমরা যাচ্ছি কঙ্কণ দেখতে প্যারাডাইসে।'

'তাই নাকি! বাঃ! তুমি বুঝি হিন্দি ছবি ভালোবাসো।'

মণ্টু বিপদে পড়লো। সে-বেচারার এই প্রথম অভিযান হিন্দি ছবিতে, কিন্তু তা সে প্রকাশ করলো না—আড়চোখে আমাকে দেখে নিয়ে অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে বললো, 'হ্যাঁ।'

'আমি কিন্তু ভাই একটাও দেখিনি।'

অত্যন্ত উৎসাহিত হ'য়ে মণ্টু বললো, 'তাহ'লে চলুন না আমাদের সঙ্গে—লীলা চিটনিস আর অশোককুমার—ওঃ, কী তোফা করে।'

আমার হাসি রাখা দায় হ'লো; বললুম, 'এই চালিয়াৎ, তুই ক'বার দেখেছিস রে?'

আমার কথা মণ্টু গ্রাহ্যই করলো না—ইস্কুলের বন্ধুদের কাছ থেকে যা সংগ্রহ করেছে তাই ভদ্রলোকের কাছে

নিজের ব'লে চালাতে লাগলো। আর সে-ও তেমনি সব কথাতেই ছু'চোখ বড়ো ক'রে দারুণ অবাক হবার ভাণ করলো। অবশেষে কোন জন্মে লাইটহাউস পার হ'য়ে যখন গাড়ি প্যারাডাইস ধরো-ধরো, তখন খেয়াল হ'লো তার। 'তাই তো, লাইটহাউস যে ছাড়িয়ে এলাম।'

'খুব ভালো হয়েছে—' মণ্টু হাততালি দিয়ে উঠলো— 'আমি তো দেখেইছি যে লাইটহাউসের গলি ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমি ইচ্ছে ক'রেই চুপ ক'রে ছিলাম।'

'ভারি তো চালাক তুমি!'—মণ্টু গর্বের হাসি হেসে মাথা নিচু করলো।

আমার দিকে তাকিয়ে নেহাৎ যেন নিরুপায় ভাব ধ'রে বললো, 'কী করি বলুন তো?'

মুখের হাসি যথাসম্ভব গোপন ক'রে বললাম, 'কপালে যখন দুর্গতি লেখাই আছে তখন তা খণ্ডনের চেষ্টা না-করাই ভালো।'

'তাহ'লে আপনি বলছেন—'

মণ্টু ফোঁশ ক'রে উঠলো, 'দিদি আবার বলবে কী, আপনাকে যেতেই হবে আমাদের সঙ্গে।'

এলাম প্যারাডাইসে। পাখার তলা বেছে তিনখানা ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট করা হ'লো—প্রথমে আমি, মাঝখানে সে, আর তার পাশে মণ্টু। রেকর্ড বাজানো হচ্ছে তখন। ও বললো, 'পান খাবেন?'

'না।'

'সে কী! সিনেমায় আর বিয়ে-বাড়িতে নাকি আবার মানুষে পান খায় না। আমি নিয়ে আসি গিয়ে।'

আমি হাত বাড়িয়ে রাস্তা আটকে বললুম, 'কী আশ্চর্য, সত্যিই আমি পান খাই না—তাছাড়া এই তো এক্ষুনি আরম্ভ হবে—দেখছেন না দরজা বন্ধ করছে, ইণ্টারভেলে বরং যাবেন।'

সত্যি-সত্যি একটু পরেই আরম্ভ হ'য়ে গেলো।

খানিকক্ষণ দেখার পর ও বললো, 'আচ্ছা দেখুন, এই যে অত বড়ো জমিদারের ছেলের সঙ্গে সামান্য একটা পুজুরির মেয়ের প্রেম, এটা কি ঠিক হ'লো?'

'ঠিক নয় কেন? মানুষের হৃদয়টাই আসল—টাকাটা তো আর নয়!'

'কী জানি, হবেও বা। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে—মেয়েটা দরিদ্র, ওর না-হয় বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দেবার একটা দুর্বাসনা হয়েছে, কিন্তু ছেলেটার এটা নিশ্চয়ই একটা খেলা।'

আমি উত্তেজিত হ'য়ে বললাম, 'কী বলেন তার ঠিক নেই—বড়োলোক হ'লে আর তাদের মানুষকে ভালোবাসবার ক্ষমতা থাকে না, না? তারা কেবল টাকা দিয়েই লোক বিচার করে!'

'কী জানি—বড়োমানুষের হৃদয়ের খবর কী ক'রে জানবো, বলুন।'

'সবই মানুষে হাতে-কলমে জানে না—জীবনে একটা মানুষের পক্ষে তা সম্ভবও নয়, বেশির ভাগ বিষয়ই মানুষে বুঝে নেয়। তা নইলে তো একজন লেখককে সৎ অসৎ চোর বদমাস সব রকম চরিত্র আঁকবার জন্য সব রকমই হ'তে হ'তো।'

'হবে বা।'

আমি প্রতিবাদের সুরে বললাম, 'হবে বা বলছেন কেন— এ-কথা আপনাকে আমি জোর ক'রেই বলবো যে ভালোবাসার ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।'

'বিয়ের সময় অবশ্যই ওঠে।'

আমি এবার ওর মুখের দিকে ভালো ক'রে লক্ষ্য করলাম, কিন্তু কোনো জবাব দেবার আগেই আবার বললো, 'আচ্ছা বলুন তো, গল্পটার শেষ কী হবে?'

অত্যন্ত সহজভাবে বললাম, 'শেষে নিশ্চয়ই এদের বিয়ে হবে।'

'হবে?'

'অন্তত উচিত তো—'

'আমি বলছি, না, উচিত না। ছেলেটির তো কত বড়ো ঘরে নিজের সমকক্ষ সমাজে বিয়ে ঠিক করেছেন ওর বাবা— তা ছেড়ে এখানে বিয়ে করা ওর একান্তই বোকামি হবে।'

আমি ওর মনের কথা বুঝলাম, তাই বাধা দিয়ে বললাম, 'ছবিটা কি দেখতে দেবেন না?'

'না-ই বা দেখলেন।'

'তবে এলাম কেন?'

'এসেছেন অবশ্যই ছবি দেখতে।'

'তবে?'

'তবে কী। আমি বলেছি নাকি ছবি না-দেখে আমাকে দেখুন।'

ফাজলেমি আছে মন্দ না তো। হেসে বললুম, 'এমন করলে কখনো ছবি দেখা যায়?'

আবছা অন্ধকারে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো।

ইতিমধ্যে ইনটারভেল হ'য়ে দপ ক'রে আলো জ্ব'লে উঠলো।

মণ্টু বললো, 'তোমরা কী কথাই বলতে পারো, দিদি। সারাক্ষণ কেবল ফিশফিশ করছিলে।'

ও বললো, 'আমি না।'

আমি মুখের দিকে তাকাতেই হেসে ফেললো—'তাকাচ্ছেন কেন, আমি বলেছিলাম কথা?'

বললাম, 'একটুও না।'

মৃদু হেসে এবার উঠে গিয়ে মণ্টুর জন্য চকোলেট কিনলো, আইসক্রীম কিনলো, আমার জন্য পান—খানিক খাওয়া চললো, এর পরে আবার আরম্ভ হ'লো ছবি।

অনেকক্ষণ আমাদের চুপচাপ কাটলো—আড়-চোখে তাকিয়ে দেখলুম, ভয়ানক মনোযোগ দিয়ে দেখছে।

আমি আর কথা বললাম না, কিন্তু একটু পরে সে নিজেই

বললো, 'লাইটহাউসে খুব ভালো ছবি হচ্ছে একটা—হাইফেৎসের বাজনা আছে। যাবেন নাকি একদিন?'

'আপনি বুঝি সেখানেই যাচ্ছিলেন?

'যাচ্ছিলাম, কিন্তু টিকিট পেতাম কিনা জানি না।'

'এত ভিড়?'

'তা তো হবেই, হাইফেৎস নিজে আছেন এই ছবিতে।'

'বিলেতি সংগীতে আপনার অনুরাগ আছে মনে হচ্ছে।'

'কেন, আপনার নেই?'

'ভালো বুঝি না।'

'ঐ আপনাদের এক দোষ। বুঝি না আবার কী—কান দিয়ে শুনে-শুনে অভ্যেস করলেই বোঝা যায়। এ-জন্যে আর পণ্ডিত হ'তে হয় না। চলুন না একদিন—ছবিটা দেখে আসবেন। খুব ভালো লাগবে বাজনা।'

'বেশ তো।'

'আমার তো আবার বিষ্যুৎবার ছাড়া ছুটি নেই।'

হঠাৎ যেন আমার ভিতরকার উদ্ধত বড়োমানুষি মাথা নাড়া দিয়ে উঠলো। দোকানদারের আশকারা তো কম নয়। ওঁর সঙ্গে ছাড়া আমি যেতে পারি না—আর গেলেও তো টিকিটখানা আমাকেই কিনতে হবে, ওঁর দৌড় বড়ো জোর ন' আনা। ছবি দেখতে-দেখতেই বললাম, 'আপনার বিষ্যুৎবার ছাড়া ছুটি নেই বটে—কিন্তু আমি তো যে-কোনো দিনই যেতে পারি।'

'হ্যাঁ, সে তো আপনি পারেনই, কিন্তু—'

'কিন্তু আর কী—আজ তো নেহাৎই দৈবযোগ।'

আমার সঙ্গে ব'সে সিনেমা দেখছে—এর চাইতে ভাগ্য ওর আর কী থাকতে পারে—এটা বোঝাবার জন্য আমি ব্যস্ত হ'য়ে উঠলাম।

ও বললো, 'দৈবটাকে আরেকদিনও ইচ্ছে করলে যোগ করা যায়, এ-কথাই আমি বলছিলাম।'

গম্ভীরমুখে বললুম 'না, তা যায় না—অন্তত সব ক্ষেত্রে যায় না।'

'তা তো বটেই—' মুখ ম্লান ক'রে ও ছবির দিকে তাকিয়ে রইলো।

মনে-মনে আত্মপ্রসাদ ভোগ করতে লাগলুম। কিন্তু অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটবার পরে মনে হ'লো এ-গুমোটটা সৃষ্টি না-করাই উচিত ছিলো। আমিই তো নিয়ে এসেছি, ও তো নিজে থেকে আসেনি। ভাবতে লাগলাম, কী ভাবলাম জানি না—কিন্তু কেমন-একটা চাপা অশান্তিতে মন ছেয়ে গেলো।

এক মুহূর্তও আর ব'সে দেখতে ইচ্ছে করলো না। আর যত রাগ সমস্তই সঞ্চিত হ'তে লাগলো ওর উপর। মনে হ'তে লাগলো কেন এসেছিলাম। এক সময় অত্যন্ত বিরক্তভাবে বললাম, 'কী কুক্ষণেই এসেছিলাম—শেষ হ'লে বাঁচি।'

প্রতিপক্ষ থেকে কোনো জবাব না-পেয়ে মনটা আরো বিরূপ হ'য়ে উঠলো—খানিক পরে সোজাসুজি বললাম, 'ভালো লাগছে আপনার এ-সব রাবিশ ? আশ্চর্য !'

মৃদু হেসে চুপ ক'রে রইলো।

আবার বললাম, 'মানুষের রুচি জিনিশটা যে কতদূর নামতে পারে তার চরম দৃষ্টান্তই হচ্ছে আমাদের দেশের এই রাবিশ-গুলো। আমি তো সইতেই পারিনে।'

'এলেন কেন ?'

দপ ক'রে জ্ব'লে ওঠবার অবকাশ পেলাম এবার। বিদ্রূপের হাসি হেসে বললাম, 'এলাম কেন তার কৈফিয়ৎ কি শেষে আপনার কাছে দিতে হবে নাকি ?'

'দিলেনই বা—'

'বটে ?'

আমার এ-উত্তরের পরে এতক্ষণে ও ছবি থেকে মুখ ঘোরালো। আবছা অন্ধকারে সে-মুখ জ্ব'লে উঠলো আমার চোখে। আর আমার সমস্ত মন নিমেষে সংকুচিত হ'য়ে উঠলো তার চোখের দিকে তাকিয়ে। নিজের ঔদ্ধত্যে লজ্জিত হ'য়ে মাথা নিচু করলাম।

এর পরে ছবি শেষ হওয়া পর্যন্ত সে আর আমার সঙ্গে একটিও কথা বললো না।

ছবি শেষ হ'লে বাইরে এসে আমরা গাড়িতে উঠলাম—কিন্তু

সে আর উঠলো না, হাসিমুখে ধন্যবাদ জানিয়ে মিশে গেলো রাস্তার জনারণ্যে। মণ্টু ব্যস্ত-ব্যাকুল হ'য়ে ডাকলো, কিন্তু সে-ডাক তার কানে গেলো না।

বাড়ি আসবার সমস্তটা পথ আমি গুম হ'য়ে ব'সে রইলুম, আর মণ্টু অনর্গল বকতে লাগলো। এক সময় সে বললো, 'ছাখো দিদি, অভিলাষবাবুকে তোমরা অত পছন্দ করো কেন বলো তো? এই ভদ্রলোক তার চেয়ে অনেক চমৎকার। কী সুন্দর দেখতে।'

আমি বললাম, 'অভিলাষবাবুর সঙ্গে এঁর তুলনা! যেমন তুই, তেমনি তোর পছন্দ।'

মণ্ট ভীষণ বিজ্ঞ হ'য়ে গেলো—সেই মুহূর্তেই চোখ কুঁচকে দারুণ অবহেলার ভঙ্গিতে বললো, 'ওঃ, অভিলাষবাবু—তোমরা কিছু বোঝো না। আমাদের ফার্স্ট ক্লাশের সুধীন-দা বলেন—মানুষ হবে মানুষের মতো—হাত পা নাক মুখ হ'লেই তো আর হ'লো না—আসল হচ্ছে তার হৃদয়—আর সেই হৃদয় বোঝা যাবে তার চোখে—'

আমি বিস্মিত হ'য়ে তাকালাম মণ্টুর দিকে। বারো বছরের বালক—এই সেদিন ওকে ব'লে-ব'লে কথা শিখিয়েছি—ধ'রে-ধ'রে হাঁটিয়েছি—সে বোঝে চোখের ভাষা! স্তম্ভিত হ'য়ে তাকিয়ে রইলাম।

চোখ! সত্যিই কি ওর চোখে ওর হৃদয়ের ভাষা? আরো

শোনবার জন্য আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন ব্যাকুল আবেগে অপেক্ষা করতে লাগলো।

ওর ফার্স্ট ক্লাশের সুধীন-দা যে ওর কাছে একজন বিশেষ কেউ এ-কথা স্পষ্টই বুঝে বললাম, 'তোর সুধীন-দাই বুঝি জগতের সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ব্যক্তি ?'

'সর্বাপেক্ষা কেন—তা তো বলিনি—কিন্তু খুব।'

'বুদ্ধিমান আর নির্বোধের তুই কী বুঝিস রে ?'

'বুঝি না! নিশ্চয়ই বুঝি। আমাদের পঞ্চাননটাই তো একটা গোবর। সবাই জানে ও গোবর। জানো দিদি, সুধীন-দা স্বদেশী।'

'স্বদেশী আবার কী রে ?'

'ও মা, সে কী! স্বদেশী জানো না! এই যে দেশে হাহাকার পড়েছে, লোকে খেতে পাচ্ছে না—এদের জন্য আত্মদান—এর প্রতিবিধান—এ-সবই তো স্বদেশী করা। সুধীন-দার তুই দাদা তো জেলে!'

'মন্টু, তুই যে অনেক শিখেছিস। মা-বাবা এ-সব শুনলে তোকে কী-শাস্তি দেবেন জানিস ?'

'মা-বাবা ? মা-বাবাকে আমি বলবোই নাকি এ-সব!' মন্টু একটু ভীতভাবে বললো।

'তবে আমাকে যে বললি বড়ো।'

মন্টুর মুখ চুন হ'য়ে গেলো। কাকুতি ক'রে বললো, 'তুমি ব'লে দিয়ো না, দিদি।'

আমি দুই হাতে ওকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করলাম।

৫

মা তখনো ফেরেননি। শান্তি বোধ করলাম। মনে হ'লো এই অবকাশ আমার দরকার ছিলো। মণ্টু বললো, 'দিদি, আজ কিন্তু আমি একটু চা খাবো।'

মা বাড়ি না-থাকলেই মণ্টুর এই এক আব্দার। আমার বাবার চা খেতে দিতে আপত্তি নেই, কিন্তু মা চা জিনিশটা একদম বরদাস্ত করেন না। আজ যেন মণ্টু হঠাৎ আমার বন্ধু হ'য়ে গেলো—মনে হ'লো ওর সঙ্গে ব'সে গল্প ক'রে অনায়াসে চা খাওয়া যায়—ওকে সঙ্গী পেয়ে আমি যেন খুশি। চায়ের কথা ব'লে নিজের ঘরে এলুম। মনের মধ্যে যে-কথা এতক্ষণ চাপা ছিলো—একলা ঘরে সেটা আমার গলা চেপে ধরলো। কিছু দরকার ছিলো না তার রাগ করবার। আর অত ফুটুনিই বা কিসের। সে কি এটুকু বোঝে না যে তার কাছে আমি রানি, আমি যে তাকে আমার সমান আসনে বসিয়েছি সেটা যে আমার দয়া, এ-কথা কি সে বোঝে না? নিজের গরবে নিজেই ফুঁশতে লাগলাম একলা ঘরে। আর একটা অনির্দেশ্য যন্ত্রণা আমাকে দংশন করতে লাগলো অবিরাম।

কাপড়-জামা ছেড়ে স্নান করতে গেলাম। কতক্ষণ যে

সেখানে চুপ ক'রে ব'সে ছিলাম জানি না—এক সময় দরজায় মণ্টুর করাঘাত শুনে চমকে উঠলুম। অন্যমনস্ক হ'য়ে কী ভাবছিলাম এতক্ষণ? আমার সমস্ত হৃদয়-মন জুড়ে কে ছিলো? লজ্জা করতে লাগলো নিজের কাছেই, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এও অনুভব করলুম যে একবার মনোহারি দোকানে আমার না-গেলেই নয়। কেন দুঃখ দিলুম, কেন দিলুম অভিমান করবার অবকাশ, তাকে অপমান করবার আমার কী-অধিকার আছে। আমি যাবো তার কাছে, ক্ষমা চাইবো, স্বীকার করবো অপরাধ। মনে হ'তে লাগলো, এক্ষুনি না-গেলে যেন দেখা পাবো না, আমার অপরাধ ক্ষালনের আর যেন সময় পাবো না আমি। ত্রস্তে স্নান সেরে বাইরে এলুম। মণ্টুকে বললুম, 'মণ্টু, আমি একটু বেরুবো, এক্ষুনি বেরুবো—তুই চা খেয়ে নে।'

'তুমি?'

'আমি এসে খাবো।'

মণ্টর ভাবের ব্যতিক্রম হ'লো না—লাফাতে-লাফাতে নিচে নেমে গেলো সে। আমি অত্যন্ত সাধারণভাবে সেজে (যা আমি কক্ষনো করি না) গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলুম। কিন্তু মনোহারি দোকানের সামনে গিয়ে দুর্নিবার লজ্জায় আমি ম'রে গেলুম যেন, মনে হ'লো ফিরে যাই। দোকানের দরজার একটা অংশ খোলা, আর সমস্ত বন্ধ। গাড়ি থেকে

নামতে-নামতে কেবল ভাবতে লাগলুম—না গেলুম, না গেলুম, কিন্তু পা আমার বাধা মানলো না। দরজা দিয়ে ঢুকতেই দেখলুম ওর মা ভিতরের দরজা দিয়ে এগিয়ে আসছেন। চোখে চোখ পড়তেই তিনি হাসিমুখে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। 'এসো মা, এসো।'

আমি পায়ের ধুলো নিলুম। বসলুম এসে ঘরে—খাটের উপর, চেয়ারের উপর, মেঝেতে কাগজে বইয়ে একেবারে ছড়াছড়ি। ওর মা তা-ই ঠেলে-ঠেলে আমাকে বসবার জায়গা ক'রে দিতে-দিতে বললেন, 'এমন অদ্ভুত ছেলে দেখিনি—কী নোংরাই করতে পারে।'

তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'গেছে আজ সিনেমায়—এক বছরের মধ্যেও তো যায় না—আজ কী খেয়াল হ'লো। দোকান বন্ধ—সকাল থেকে কোথাও গেলো না, কিছু করলো না; কেবলই ছটফট ক'রে-ক'রে খেয়ে উঠে বললে, "আমি সিনেমায় যাই।" কিন্তু এখন তো ফেরা উচিত।'

আমি অবাক হ'য়ে বললাম, 'ফেরেননি?'

'কোথায়! আমি তো জুতোর শব্দেই বাইরে দেখতে যাচ্ছিলাম—দেখলাম, তুমি।'

'আশ্চর্য!—ফেরা উচিত ছিলো।'—আমি একটু উদ্বেগের সুরেই বললাম কথাটা।

আমার উদ্বেগে ভদ্রমহিলা ঈষৎ উৎকণ্ঠিতভাবে বললেন, 'বাইরে থাকাটা একেবারেই ওর স্বভাব নয়। যা ওর বাড়িতে ব'সেই। বই নিয়েই আছে সারাক্ষণ।'

আমি বললাম, 'আপনি ব্যস্ত হবেন না, এক্ষুনি হয়তো এসে পড়বেন।'

'কী জানি, কলকাতার রাস্তা।' একটু চুপ ক'রে থেকে উনি বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই চা খাও?'

'খাই, কিন্তু এখন খাবো না।'

ঘর অন্ধকার হ'য়ে এসেছিলো, উঠে গিয়ে আলোটা জ্বেলে দিতে-দিতে বললেন, 'কেন? খাও না, আমার কিছু অসুবিধে হবে না।'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আপনি একটুও ব্যস্ত হবেন না—আরেক দিন এসে নিশ্চয়ই আমি চা খেয়ে যাবো। আজ আমি যাই।'

'সে কী! এইমাত্রই তো এলে, বোসো একটু—খোকা আসবে এক্ষুনি।'

এ-কথায় আমি লজ্জিত বোধ করলুম। বললুম, 'আমি আপনাকে দেখতেই এসেছিলাম—কিছুক্ষণ থাকবারও আমার ইচ্ছে, কিন্তু আমার মা আজ সারাদিন বাড়ি নেই—ফিরে এসে আমাকে দেখতে না-পেলে হয়তো অস্থির হবেন।'

'তাহ'লে আর আটকে রাখি কেমন ক'রে,' উনিও

উঠে দাঁড়ালেন, 'আরেক দিন বেশি সময়ের জন্য এসো, কেমন ?'

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

দোকানের আধখানা-খোলা দরজায় পা দিতেই চোখোচোখি হ'য়ে গেলো তার সঙ্গে। আমি বিনা সম্ভাষণেই সিঁড়ি টপকে রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম, সেও একটি কথা না-ব'লে উঠে গেলো দোকানের মধ্যে। কিন্তু গ্রেপ্তার করলেন ওঁর মা, 'খোকা, ওকে চিনতে পারলি না ? অভিলাষের বৌ !'

খোকা ভাণ করলেন, 'ও, তা-ই নাকি—' ফিরে এসে— 'কখন এসেছিলেন ?'

আমি গাড়িতে উঠতে-উঠতে গম্ভীর হ'য়ে বললাম, 'এই খানিকক্ষণ—'

'যাচ্ছেন যে ?'

'যাবো না ?'

'আমি তো এইমাত্র এলুম।'

'আপনার জন্যে তো আসিনি।'

'তবে ?'

'তবে আর কী।'

এ-কথার পরে সে চুপ ক'রে গাড়ির দরজা ধ'রে একটু দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর হাত সরিয়ে জোড়হাতে নমস্কার জানিয়ে বললো, 'আচ্ছা।'

কিন্তু পিছন ফিরতেই আমি আবার ডাকলাম, 'শুনুন।'

চকিতে ঘুরে দাঁড়ালো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। মুখ নিচু ক'রে বললাম, 'রাগ করেছেন নাকি?'

'না তো।'

'তবে যে আমাদের সঙ্গে এলেন না?'

'অন্য কাজ ছিলো।'

'না, ছিলো না।'

মৃদু হেসে বললো, 'আপনি জানেন ছিলো না? আশ্চর্য! তবে সত্যি কথাই বলি—দেখুন, অভ্যেসই আমাদের অন্য-রকম। এই আমাদের মতো দরিদ্রের কথা বলছি আরকি—গাড়িতে ব'সে ঠিক যেন জুৎ পাই না—জনগণে মিশে ধাক্কাধাক্কি করতে-করতে না-এলে মনে হয় আমি যেন আর আমাতে নেই।'

সে-কথার জবাব না-দিয়ে আমি আমার কথাতেই ফিরে এলাম, 'আমি জানি আপনার কোনো কাজ ছিলো না—কেবল আমাকে কষ্ট দেয়া।'

'কষ্ট! আপনাকে? আপনি তাতে কষ্ট পেয়েছিলেন?'—কথা ক'টা বলতে ওর কণ্ঠস্বরে ঢেউ উঠলো যেন।

'কষ্টই তো।'—অভিমানে গলা ধ'রে এলো আমার।

আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলো একটু, তারপর

অত্যন্ত নিচু গলায় বললো, 'আজ আমি অভিলাষের একটা চিঠি পেয়েছি।'

'অভিলাষের চিঠি!' হঠাৎ আমি জেগে উঠলাম স্বপ্ন থেকে। আমি যেন ছিলাম না এই পৃথিবীতে—এটুকু সময়ের জন্য আমার মনে ছিলো না অভিলাষকে—মাকে, বাবাকে—সংসারের আরো অনেক জটিলতাকে। আমার মুখ হয়তো বিবর্ণ হ'য়ে উঠেছিলো। অস্ফুটে বললাম, 'কেন, চিঠি কেন?'

'অভিলাষ এখনো বদলায়নি দেখলাম', মনের বিরক্তি যথাসম্ভব গোপন ক'রে সে বললে।

আমি দ্রুতস্বরে বললাম, 'চিঠিখানা দেখাতে পারেন?'

অন্যের চিঠি দেখতে চাওয়া অসংগত, এমনকি, সেটা অভদ্রতা। সবই বুঝলাম, তবু সে-ইচ্ছা চেপে রাখতে পারলাম না আমি। অভিলাষের হীনতা দিয়ে ভরা চিঠিখানার স্বরূপটা কী, তা একবার দেখবার জন্য প্রাণ আমার ছটফট করতে লাগলো।

'চিঠিখানা আপনার পক্ষে তেমন গৌরবের নয়, তাছাড়া তাতে এমন কতগুলো কথা আছে যা আমাতে আর অভিলাষেই আবদ্ধ থাকা ভালো।'

আমি ঈষৎ ঝাঁঝ দিয়ে বললাম, 'তাই নাকি!' আরো বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ মণ্টুর গলা পেলাম, 'দিদি!'

চমকে চোখ ফিরিয়ে আমি স্তম্ভিত হ'য়ে দেখলাম, আমাদের ছোটো গাড়িটা ক্যাঁচ ক'রে থেমে গেলো সেখানে। গাড়ি ড্রাইভ করছেন আমার বাবা—তাঁর পাশে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে আমার মা, আর পিছনে মন্টু।

আমার হাত-পা অবশ হ'য়ে এলো। ভয়ে আমি শব্দ বার করতে পারলাম না। অসহায় দৃষ্টিতে তাকালাম একবার ওর দিকে, পরক্ষণেই আমার বাবা অসাধারণ গম্ভীর মুখে নেমে এলেন আমার গাড়ির সামনে। ওকে সম্পূর্ণ অবহেলা ক'রে আমাকে বললেন, 'এখানে কী করছো?'

প্রাণপণে গলার মধ্যে সমস্ত শক্তি সঞ্চয় ক'রেও কথা বলতে পারলাম না, ভিতু চোখে তাকিয়ে রইলাম বাবার দিকে। বজ্রের মতো শব্দে তিনি বললেন, 'বাড়ি চলো।' তাকিয়ে দেখলাম, সেই মানুষটি অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য দেখছে অবাক হ'য়ে।

দুই গাড়িতে ভাগাভাগি ক'রে চ'লে এলাম বাড়ি। আর এর পরেই আমার সত্যিকারের নির্যাতন শুরু হ'লো মা বাবার কাছে। মা-ও যে এরকম নীচ হ'তে পারেন এ আমার ধারণা ছিলো না। স্ত্রীলোক যখন স্ত্রীলোকের উপর নিষ্ঠুর হয়, তখন বোধ হয় মা-ও আর মা থাকে না।

বাড়ি এসেই মা বললেন, 'ও-লোকটা কে?'

বললাম, 'উনি অভিলাষের বন্ধু।'

'অভিলাষের বন্ধু, কিন্তু অভিলাষ তো নয়—তবে তোমার ওর কাছে কী দরকার।'

'দরকারের জন্য নয়, হঠাৎ দেখা হ'লো।'

'সিনেমা থেকে এসেই তোমার হঠাৎ দেখা হবার পথে যাবার কী-প্রয়োজন ছিলো?'

বাবা ঢুকলেন ঘরে। গম্ভীর মুখে বললেন, 'রুনি, আজ বাদে কাল তুমি একজন আই. সি. এস-এর স্ত্রী হচ্ছো, একজন মানী লোকের পুত্রবধূ; তোমাকে কি মানায় এ-সমস্ত রাস্তার লোকের সঙ্গে মেশামেশি? আর অভিলাষ যেখানে অনিচ্ছুক।'

অভিলাষের নাম শুনেই আমার সর্বশরীর জ্ব'লে গেলো। উদ্ধতভাবে বললাম, 'অভিলাষের ইচ্ছায় আমার কী এসে যায়!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মা বললেন, 'নিশ্চয় এসে যায়। এই আজ থেকে আমি তোমাকে ব'লে দিলাম, আমার অনুমতি ছাড়া তুমি এক পা বাড়ি থেকে বেরুবে না।'

বাবা মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

এর পরে মা আমার হাতে দু'খানা চিঠি দিয়ে বললেন, 'নাও, প'ড়ে ছাখো।'

দুখানা চিঠিই অভিলাষের। একখানা আমার নামে; সেখানা বন্ধই আছে, আরেকখানা খোলা চিঠি—মা-র।

কী লিখেছে অভিলাষ এই-সব চিঠিতে, কী বলতে চায় ও? উঠে নিজের ঘরে চ'লে এলাম। ছিঁড়ে ফেললাম চিঠির মুখ। ইংরিজিতে লেখা।

'প্রিয় রুনি—

ভালো বাংলা আমার আসে না, তাই ইংরিজিতে লিখছি। বিলেত থেকে ফিরে এসে অবধি তো এমনিতেই ডাঙার মাছ হ'য়ে আছি। ও-দেশের ছেলেমেয়ে, তাদের হাব-ভাব চলন-বলন এখনো আমাকে সমানেই টানছে। এ-দেশের কথা আর বলবো কী!

তোমাকে একটা কথা লিখি। তুমি আর কখনো সেই স্টেশনারি শপটাতে যেয়ো না। ও-লোকটাকে আমি ছেলেবেলা থেকে চিনি। অতিশয় ইতর এবং গ্রাম্য। আমি চাই না আমার স্ত্রী সে-সব বাজে লোকের সংস্পর্শে যে-কোনো কারণেই কখনো আসে। তোমার সর্বদাই স্মরণ রাখা কর্তব্য তুমি একজন আই. সি. এস.-এর স্ত্রী। আমি আগামী সপ্তাহের শেষ তারিখে যাচ্ছি। আশা করি বিবাহের জন্য প্রস্তুত আছো। আমার চুম্বন নিও।'

স্কাউণ্ড্রেল!

চিঠিখানা টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে পায়ের তলায় চেপে ধরলাম। বাংলা উনি জানেন না! ইংরিজিটা শিখলেন কবে? মা-র চিঠিখানা খুললুম।

'মাসিমা,

ভেবেছিলাম এত সব কথা চিঠিতে না-লিখে ব'লেই আসবো, কিন্তু সময় বা সুযোগের অভাবে সেটা হয়নি। রুনিকে

আমি ছেলেবেলা থেকে জানি—সে ভীষণ জেদি মেয়ে—যদি বেঁকে যায় সোজা করা সহজ হবে না, এজন্য একখানা বিস্তৃত চিঠি লেখা প্রয়োজন মনে হচ্ছে। নয়তো আমার সময়ের মূল্য এত কম নয় যে লম্বা-লম্বা বাংলা চিঠি লিখে তা নষ্ট করা যায়।

আমি আপনাকে বলেছিলাম চৌরাস্তার মোড়ে যে-মনোহারি দোকানটি আছে রুনি সেখানে প্রায়ই যায় এবং সেই ইতর দোকানিটার সঙ্গে মেলামেশা করে। এর তুল্য অপমানকর ব্যাপার আমাদের সমাজে আর-কী হ'তে পারে। রুনির এই অধঃপতনে আমি মর্মাহত। আপনাদের মতো সম্মানী, ধনী এবং যোগ্য পিতামাতার সন্তান হ'য়ে রুনির এই রুচি-বিকার বড়োই আশ্চর্যের বিষয়। সেদিন লেকে বেড়াতে গিয়ে ফেরবার পথে ঐ দোকানে সিগারেট কিনতে নেমেছিলাম; রুনিকে গাড়িতে বসিয়ে রেখেই যাচ্ছিলাম, কেননা আমাদের মতো ঘরের মেয়েদের পক্ষে এই সব বাজে দোকানে নেমে জিনিশ কেনা মানেই দশজনের সমান হ'য়ে যাওয়া। আমি মনে করি এতে ডিগনিটির যথেষ্ট হানি হয়। নেহাৎ প্রয়োজন না-হ'লে আমি নিজেও কখনো বাঙালির দোকানে কিছু কিনি না। কিন্তু রুনি আমার অনুমতির অপেক্ষা না-ক'রেই সোজা নেমে এলো দোকানে এবং অনর্থক কতগুলো বাজে রুমাল কিনলো। আমি বারণ করতেই

সে খেপে গিয়ে দাম না-দিয়েই সমস্ত রুমাল নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো। আমার তখুনি সন্দেহ হয়েছিলো এদের পরিচয় কেবলমাত্রই আজ না। পরে আমি ড্রাইভারের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম রুনি গাড়ি নিয়ে যখনই একা বেরোয় তখনই এই দোকানে আসে এবং ঘণ্টা দু'তিন থাকে।'

এই পর্যন্ত প'ড়ে আমি স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম।

মণ্টুকে ডেকে আনলাম ঘরে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'মা কখন ফিরলেন, মণ্টু?'

'তুমি বেরিয়ে যাবার খানিক পরেই।'

'আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, এসেই বললেন, রুনি কই? আমি বললাম, গাড়ি নিয়ে কোথায় যেন গেলো। মা কিছু না-ব'লে চ'লে যাচ্ছিলেন ঘরে, এর মধ্যে রামদীন দু'খানা চিঠি দিয়ে গেলো হাতে। একখানা চিঠি খুলে প'ড়েই মা রেগে অস্থির হ'য়ে গেলেন, আর তোমাকে বকতে লাগলেন। বাবা ফিরে আসতেই বাবাকে চিঠিটা দেখালেন, তারপর দু'জনে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি সঙ্গে গেলাম।'

'হুঁ। আচ্ছা, তুই যা—'

মণ্টু চ'লে গেলে আমি তখুনি কিছু করলাম না, কিন্তু একটু পরেই মা-র ঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম। মা গালে হাত দিয়ে ব'সে আছেন খাটের উপর, বাবা তাঁর পাশেই

ইজি-চেয়ারে ব'সে কথা বলছেন, আমার উপস্থিতি তাঁরা লক্ষ্য করলেন না কিছুক্ষণ—আমি তাঁদের কথা শুনলাম—মা বলছেন, 'রুনির যথেষ্ট বয়স হয়েছে, সে যদি তার নিজের ইচ্ছা খাটাতে চায়ই তাহ'লে আমার আর তোমার সাধ্যে কুলোবে না তাকে রোধ করা।' বাবা হেসে উঠলেন। 'তুমি পাগল হয়েছো! এটুকু বুদ্ধি রুনিরও আছে যে একজন আই. সি. এস.-এর স্ত্রী হবার মতো সৌভাগ্য খুব কম মেয়েরই হয়। এ-সৌভাগ্য সে ঠেলবে না।'

'তা জানিনে, কিন্তু অভিলাষের উপর তার আর মন নেই।'

'মন আবার কী। ও-সব মন থাকা না-থাকার কথাই ওঠে না এখানে।'

'রুনি যদি বলে, আমি অভিলাষকে বিয়ে করব না।'

'আমি বলবো, আলবৎ করবে—করতেই হবে তোমাকে।' উত্তেজনায় বাবা ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠলেন। আমি পিছন থেকে ডাকলাম, 'বাবা।'

হঠাৎ যেন ঘরটা একেবারে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো।

মা বাবা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন দু-একবার, তারপর বাবা অত্যন্ত গম্ভীর ভাব বজায় রেখে বললেন, 'কী?'

খানিকক্ষণ কথা বলতে পারলাম না, তারপর সমস্ত ভয় কাটিয়ে আমি স্পষ্ট স্বরে বললাম, 'আমি অভিলাষকে বিয়ে করবো না।'

বজ্রপতনেও মানুষ এত বিহ্বল হয় না বোধ হয়। মা বাবা দুজনেই চমকে চোখ ফেরালেন আমার দিকে। একটু পরেই বাবা গ'র্জে উঠলেন, 'কেন ?' মাথা নিচু ক'রে বললাম, কেন তা বলবো না, কিন্তু বিয়ে তোমরা ভেঙে দাও।'

'কক্ষনো না। হতভাগী, তোর চোখে কি সেই দোকানদারটাই বড়ো হ'য়ে উঠলো ?'

'মানুষ হিশেবে সেই দোকানদার অভিলাষের অনেক উপরে—কিন্তু তার কথা এখানে ওঠে না। তবে এটুকু আমি তোমাদের বলতে পারি যে অভিলাষকে আমি কখনোই বিয়ে করবো না।'

'নিশ্চয়ই করবে, করতেই হবে, বিয়ে করার কর্তা তুমি নও, বিয়ে দেবার কর্তা আমি। যাও এখান থেকে !'

বাবা অস্থিরভাবে উঠে দাঁড়ালেন—আমি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে স্খলিত পায়ে চ'লে এলাম ঘরে এসেই শুয়ে পড়লাম বিছানায়। মাথার শিরাগুলো দপদপ করতে লাগলো। কী হ'লো বুঝতে পারলাম না ঠিক। আমি কি ভালোবাসি তাকে ? নয়তো অভিলাষের উপর এ-বিদ্বেষ আমার এতদিন কোথায় ছিলো ? তাকে আমি ভালোবাসিনি হয়তো, কিন্তু এত ঘৃণাও তো ছিলো না।

দু'দিন চুপচাপ কাটালাম; আমিও কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলিনি, তাঁরাও আমাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চললেন। কিন্তু মন অস্থির হ'লো তৃতীয় দিন—হঠাৎ একখানা চিঠি পেলাম অভিলাষের বাবার—আমাকে লেখা নয়—চিঠিখানা বাবার নামেই এসেছে। আমার হাতে সে-চিঠি পড়লো। আমি আর তাঁদের হাতে না-দিয়ে সোজা নিয়ে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করলাম। বাবার টেলিগ্রামের উত্তর সেখানা।

'বিজয়,

তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে অবাক হলাম। হঠাৎ এত কী জরুরি দরকার হ'লো যে টেলিগ্রামেই এত কথা লিখেছো? আজ অভির চিঠিও পেলাম—সেও খুব অস্থির হ'য়ে পড়েছে বিয়ের জন্য। তোমরা সকলেই খুব বিচলিত। কেন বলো তো?

যা-ই হোক—তোমার কথার জবাব আমি দিচ্ছি। অভি যে রেজিস্ট্রি ক'রে বিবাহ করবে এ-খবর পেয়ে আমি সুখী হইনি। তোমার টেলিগ্রামে জানলাম, তুমিও তা চাও না, অতএব মাঝে চৈত্র ছেড়ে বৈশাখের প্রথম সপ্তাহেই তুমি হিন্দুমতে বিবাহ সম্পন্ন করতে ইচ্ছুক। উত্তম কথা—আমি তো প্রস্তুতই—তবে বর্তমানে আমার একটু টানাটানির সময় পড়েছে, হাজার

দশেক টাকা তুমি আমাকে অবশ্যই দেবে। অভি লিখেছে বলতে তার লজ্জা করে—কিন্তু তার ইচ্ছে আমাদের বালিগঞ্জেও যে-একখণ্ড জমি কেনা আছে, তার উপর তুমি ছোটোখাটো একখানা বাড়ি তাকে তুলে দাও—আর ও-জমি তুমি আমার থেকে কিনে নিয়ে জামাইকে যৌতুক দাও। তোমারই জামাই—তোমারই মেয়ে—আমি আর কী বলবো। গহনা-টহনা যেমন তোমার খুশি দিয়ো, তবে সবই সোনার দিয়ো—আজকালকার পাথর-বসানো জিনিশগুলো কোনো কাজের নয়। একশো ভরির নিচে সোনা যেন না হয়।

আমার কোনোই দাবী-দাওয়া নেই। এটুকু মাত্র ইচ্ছা। আশা করি তা পূরণ করতে তোমার অসুবিধা হবে না। আমি দিন দশেকর মধ্যে একবার যাবো, কন্যা আশীর্বাদ ক'রে আসবো তখন।'

চিঠিখানা প'ড়ে আমি স্তম্ভিত হলাম। মানুষের ইতরতারও তো একটা সীমা থাকে! ভদ্রলোক তাঁর উপযুক্ত পুত্রই তৈরি করেছেন। একখানা বাড়ি, একশো ভরি সোনা, দশ হাজার টাকা নগদ—ছেলে বিয়ে দিয়ে তিনি লক্ষপতি হ'তে চান দেখছি। সবেগে মার কাছে গিয়ে চিঠিখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। মা চিঠিখানা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বললেন, 'রুনি, তুমি খুলেছো এই চিঠি?'

হঠাৎ আমার খেয়াল হ'লো যে এটা বাবার চিঠি, এটা খোলা

আমার নিতান্তই অন্যায় হয়েছে। মাথা পেতে অপরাধ নিয়ে বললুম, 'হ্যাঁ মা, হঠাৎ খুলে ফেলেছিলুম।'

গম্ভীর মুখে মা বললেন, 'দরকার বোধ করলে এ-চিঠি তুমি বোধহয় লুকিয়ে ফেলতে?'

চুপ ক'রে রইলাম।

দুপুরবেলা শুয়ে-শুয়ে খবরের কাগজে চাকরির বিজ্ঞাপন দেখছিলাম। ক'দিন থেকেই এটা আমার মাথায় ঢুকেছে। চাকরি পেলে সত্যিই আমি নেবো। আমি এখন মেজর—জোর কখনোই খাটবে না আমার উপর, এ আমি জানি। অশান্তি হবে—হয়তো তাঁরা আমাকে ত্যাগ করবেন, কিন্তু কম অশান্তিতে তো আমি নেই—অভিলাষকে বিয়ে করতে হবে এই চিন্তা আমার বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে আছে—মা বাবার এই মনোবৃত্তিও তো কম যন্ত্রণা দিচ্ছে না আমাকে—তার চেয়ে এই বেশ—স্বাধীন হবো, মফস্বলে চাকরি নিয়ে দূরে থাকবো—হঠাৎ একটু তন্দ্রা এসেছিলো, মণ্টুর ডাকে চমকে উঠলাম।

'দিদি ঘুমুচ্ছো?'

'না, কেন রে?'

'তোমার চিঠি।'

উদ্‌গ্রীব হ'য়ে চিঠির খামের উপরকার লেখায় চোখ বুলোলাম। বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠলে যেন—এ-লেখা আমি চিনি না, কিন্তু তবু বুঝলাম এ-লেখা তাঁর। মণ্টুর মুখের দিকে

তাকাতেই ও বললো, শ্যামল-দা দিলেন—আমি রোজ যাই কিনা।'

'তুই রোজ যাস ?'

'রোজ যাই, শ্যামলদার মা আমাকে কত খাওয়ান—আর শ্যামলদা—ওঃ, ওয়ানডারফুল ! আমাদের ইস্কুলের হারানদা বলে যে তার দাদার মতো আর হ'তে হয় না—দেখিয়ে দিয়েছি ওকে—'

আমি গোগ্রাসে মণ্টুর কথা শুনতে লাগলাম। মনে হ'লো, কতকাল তাঁর খবর শুনিনি, তাঁকে দেখিনি, মণ্টুর আজে-বাজে কথা যে এত কাজের হ'তে পারে তা উপলব্ধি ক'রে ওকে আদর না-ক'রে পারলাম না। তারপর ও যেতেই চিঠি খুলে পড়তে লাগলাম :

'প্রীতিভাজনাসু—

প্রথমেই ব'লে রাখি যে শ্রদ্ধাস্পাদাসু সম্বোধন না-করবার জন্য আমার অপরাধ নেবেন না ; কেননা, আপনাকে আমি আমার বন্ধু হিশেবেই চিঠি লিখছি, অভিলাষের স্ত্রী ব'লে নয়।

আপনি ক'দিন আসেন না ; বলাই বাহুল্য, আমার পক্ষে সেটা সুখের হয়নি। মণ্টু বলছে আমার উপরে আপনারা কেউ তুষ্ট নন—( আপনিও কি ? ) কিন্তু সে-কথা যাক—সামনের রবিবার সিনেমায় যাবেন ? মণ্টু ভয়ানক ব্যাকুল হয়েছে, এবং ওর গরজের সঙ্গে আমার গরজও দেখছি ঠিক সমান তালেই

চলেছে। সেই ইংরেজি ফিল্‌মটার কথা আপনাকে বলেছিলাম সেদিন—হাইফেৎসের বাজনা আছে। যাবেন? যদি যান তবে মণ্টুকে দিয়ে ব'লে পাঠাবেন। আমি আগে গিয়ে টিকিট কিনে আনবো।

নমস্কার।

শ্যামল'

হিশেক করলুম, আজ শুক্রবার—রবি আসতে এখনো অনেক ঘণ্টা, মিনিট, দণ্ড, পল অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু কী করা যায়। মণ্টুকে দিয়ে অত্যন্ত সংগোপনে চিঠি লিখে পাঠালুম। ছোট্ট চিঠি—কেবলমাত্র যাবার সম্মতি জানানো, কিন্তু তলায় পুনশ্চ দিয়ে লিখলুম 'জবাব দেবেন' এ কথাটা লিখে নিজেরই খারাপ লাগলো, লজ্জা করলো, কিন্তু কালকের দিনটা আমার কাটবে কেমন ক'রে?

মণ্টু চোস্ত ছেলে—মা-বাপের নিষেধ ভাঙবার জন্যই ওর জন্ম বোধ হয়। সর্বদাই ও গোপনে ওঁদের অগ্রাহ্য করছে, এটা লক্ষ্য ক'রে কতবার শাস্তি দিয়েছি আগে। আমার বাবার কঠোর বারণ ছিলো যে-কোনো লোকের সঙ্গে মেশা, এবং বাংলা স্কুলে দিলে পাছে সে-নিষ্ঠা না থাকে এজন্য অনেক বয়স অবধি বাড়িতে রাখা হয়েছে গভর্নেসের কাছে; কিন্তু কেঁদে-কেটে যে ক'রে পারুক ভর্তি ও শেষটায় হ'লোই। বাবা চাকর-বাকরদের সঙ্গে কখনো স্বাভাবিক সুরে কথা বলেন না, সর্বদাই এটা তিনি ওদের জানতে

দেন যে তিনি মনিব—মণ্টু ঠিক তার উল্টো—তার যত মেলামেশা আবদার চাকরদের সঙ্গে—ছোটো ব'লে মার উপর অজস্র আবদার ছিলো ওর, কাজেই সর্বদাই ও নিজের ইচ্ছামতো চলতে পেরেছে; এমনকি ওর জ্বালায় আজকাল টিনে ভরা মুড়ি পর্যন্ত ঘরে থাকে, যেটা আমাদের সমকক্ষ কেউ দেখলে আমার বাবার আর মুখ থাকবে না। অভিলাষ এলে এজন্য মণ্টুকে সামলানো ওঁদের এক কাজ হ'য়ে দাঁড়ায়। এই এখনো— যেই মণ্টু বুঝেছে মনোহারি দোকানদারের সঙ্গে মেশা ওর বারণ, অমনি লুকিয়ে ঠিক সেটাই করতে আরম্ভ করেছে।

সন্ধেবেলা মণ্টুকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বুক কাঁপতে লাগলো। পকেট থেকে ও বার করলো চিঠি, তারপর আস্তে-আস্তে বললো, 'দিদি, মা আমাকে বকছিলেন জানো ?'

'কেন ?'

'ঠিক ধরেছেন আমি শ্যামলদার কাছে যাই।'

'তাতে কী ?'—আমি ভাণ করলুম।

'ও মা, তুমি জানো না—সেদিন কী-রকম রাগ করলেন তোমার উপর। সব সময় তো বলেন দোকানদারটাই যত নষ্টের গোড়া।'

'তাহ'লে তুই যাস কেন ?'

'যাবো না ? নিশ্চই যাবো। শ্যামলদার মতো আমি কাউকে ভালোবাসি না—জানো, স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার।'

মণ্টুর কথায় আমি হেসে ফেললুম। বললুম, 'এই বুঝি তোর শ্যামলদার শিক্ষা?'

মৃদু হেসে মণ্টু পালিয়ে গেলো। আমি চিঠির মুখ খুললাম।

'প্রীতিভাজনাসু,

চিঠির জবাব দিতে আদেশ করেছেন, কিন্তু কিসের জবাব তা জানিনে। আমাকে কি এ-রকম প্রশ্রয় দেয়া উচিত?

রবিবার ম্যাটিনি শোতেই আসবেন।

শ্যামল'

চিঠিখানা মুড়ে বাক্সে ভ'রে ফেললাম। তারপর এলাম মার ঘরে। মা মণ্টুর জন্য পশমের জাম্পার বুনছিলেন—গা ঘেঁষে ব'সে ( অনেকদিন এ-রকম বসিনি ) বললাম, 'কী-রকম বোনা দিচ্ছো মা—দাও না আমি বুনি।'

মা আমার ভঙ্গি দেখে অবাক হলেন, খুশিও বোধ হয় হলেন। বললেন, 'তুই তো বোনা-টোনা ছেড়েই দিয়েছিস—বাস্কেট প্যাটার্ন জানিস না?'

'কী যেন, মনে পড়ছে না—দেখিয়ে দাও তো।'

মা উৎসাহিত হ'য়ে দেখিয়ে দিতে লাগলেন, আর আমি বুনতে লাগলাম। বুনতে-বুনতে এ-কথা ও-কথার পরে বললাম, 'মা, চলো না কাল ম্যাটিনি শোতে সিনেমা দেখে আসি।'

'যাবি তুই?'—আমাকে স্বাভাবিক হ'তে দেখে মার সত্যিকার আনন্দ হ'লো। সত্যিই তো উনি চান না আমি দুঃখ পাই।

আমি বললাম, 'ভারি ইচ্ছে করছে যেতে—কাগজে দেখলাম লাইটহাউসে They Shall Have Music ব'লে একটা ছবি হচ্ছে—হাইফেৎস ব'লে একজন বিখ্যাত বেহালা-বাজিয়ের বাজনা আছে—যাবে?'

'আমি?'—মা মাথা নাড়লেন—'আমি যাবো না। তুই আর মন্টু যা...তোর বাবা বরং যাক, আমি তো আর ইংরিজি-মিংরিজি বুঝি না।'

'না মা,...সেই ভালো, আমি আর মন্টুই যাবো। সত্যি, একা-একা চলাফেরার একটু অভ্যেস দরকার।'

'তাই ভালো। তোর বাবার আবার ছবিতে যা বিরক্তি।'

পরের দিন দুটো বাজতেই বেরুলাম গাড়ি নিয়ে। মা বললেন, 'সে কী! এত আগেই যাবার কী দরকার? শো তো তিনটেতে।'

'না মা, আজকাল সময় বদলেছে,...আড়াইটেতেই আরম্ভ হয়...আবার টিকিট-ফিকিট কাটা আছে।'

প্রথমেই গেলাম দোকানে। গাড়ি থেকে নামতেই দেখলাম, বেরিয়ে আসছে আমাকে দেখে। খুশি হ'য়ে বললো, 'আসুন, আসুন, কী আশ্চর্য।'

'কেন, আশ্চর্য কেন?'

'আশ্চর্য না? মেঘ না-চাইতেই জল। এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী আছে বলুন তো?'

'ঠাট্টা করছেন?' মুখের ভাব ঈষৎ গম্ভীর করবার চেষ্টা করলাম।

'সত্যি কথা বলা তো আমার পক্ষে বাস্তবিকই অশোভন, কিন্তু কী করা যায় বলুন তো?'

একটু হেসে বললাম, 'আচ্ছা, আচ্ছা, আর আমাকে খুশি না-করলেও চলবে—চলুন তো একবার চট ক'রে মার সঙ্গে দেখা ক'রে নিই।'

বুঝতে পারলাম, খুশিতে ও অধীর হয়েছে এবং এ-ক'দিনের অদর্শনে আমার যেন পরস্পরের অত্যন্ত কাছে এগিয়ে এসেছি। আমার সমস্ত শরীরে মনে এক অভূতপূর্ব আনন্দ চলাফেরা করতে লাগলো। মণ্টুকে নিয়ে ও আগে চললো, আমি ওর পিছন-পিছন ভিতরে এসে দাঁড়ালাম ওর মার কাছে।

আবার সেই ঠাণ্ডা আর অগোছালো ঘর। সমস্ত ঘরময় শান্তি—ঘরে পা রেখেই মন ভ'রে গেলো প্রশান্তিতে।

ভদ্রমহিলা শুয়ে আছেন মেঝেতে আঁচল পেতে। রুক্ষ একরাশ চুল মেঝেতে ছড়ানো-ছিটোনো—ঐ আবছা অন্ধকারে তাঁকে ভারি সুন্দর দেখালো; আমি গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই সস্নেহে জড়িয়ে নিলেন কাছে, ঠাট্টা ক'রে বললেন, 'মাকে আর মনে পড়ে না, না? আমার মণ্টু কিন্তু তোমার চেয়ে আমাকে বেশি ভালোবাসে।'

আমি হেসে বললুম, 'না মা—মণ্টু ছেলেমানুষ কিনা—তাই

ওর প্রকাশটা উগ্র—আমার তো বয়েস হয়েছে, আমি ভিতরে রাখতে শিখেছি এবং ওজনে তা মণ্টুর চেয়ে অনেক বেশি।'

'কক্ষনো না, মাসিমা, আমি তোমাকে বেশি ভালোবাসি। তুমিই বলো তো?'

'হ্যাঁ রে পাগলা—' ভদ্রমহিলা মণ্টুকে শান্ত করলেন।

উনি ফোড়ন কাটলেন, 'এত প্রশান্তিও বড়ো বিশ্বাসযোগ্য নয়, সব জিনিশেরই একটা প্রকাশ আছে, না-থাকলে কি চলে?'

আমি জবাব দিলাম না—তাকালাম একবার চোখ তুলে। কী সুন্দর, কী উজ্জ্বল যে ওর চোখ, কেমন ক'রে বোঝাবো?

মণ্টু তাড়া দিলো, 'চলুন এবার, সময় হ'য়ে গেলো না?' নেহাৎ নির্লিপ্তের ভঙ্গি ক'রে বললো, 'কিসের সময়?' 'বাঃ, বেশ মানুষ! না, চলুন, চলুন···দিদি এসো।' ঝড়ের মতো আমাদের সব্বাইকে নিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। মা-ও এলেন সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের বিদায় দিতে।

গাড়িতে উঠে আমি বললাম, 'আপনার মা জানতেন যে আমিও যাচ্ছি?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমার কিন্তু ভারি লজ্জা করছে।'

'কেন?'

কেনর জবাব আমি দিতে পারলাম না, বাইরের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলাম।

ও মণ্টুকে বললো, 'আচ্ছা মণ্টু, আজ যদি সিনেমায় না-গিয়ে বাড়ি ব'সেই আড্ডা করতাম তাহ'লে কি তুমি রাগ করতে?'

'রাগ করবো না?' মণ্ট একেবারে আকাশ থেকে পড়লো।

'আমার কিন্তু ইচ্ছে করছিলো না আসতে?'

'খুব আশ্চর্য! আমার তো বাড়ির বাইরে আসতে পারলেই সবচেয়ে ভালো লাগে—মা বাবার ভয়েই তো শুধু নিয়ম ক'রে বেরুতে হয়।'

'তাই নাকি? তাহ'লে বড়ো হ'য়ে নিশ্চয়ই তুমি পর্যটক হবে?'

'পর্যটক? পদব্রজে পরিভ্রমণ? ওঃ, ওয়ানডারফুল!' আমি ধমকে উঠলাম, 'চুপ কর তো তুই, মণ্টু।' মণ্টুর উচ্ছ্বাসটা একটু বাধা পেলো। ও চুপ করতেই আমি বললুম, 'উপায় তো এখনো আছে—ইচ্ছে না-করলে তো এখনো না-গেলেই হয়।'

'ওরে বাবা—মণ্টু কি তবে আমার মুখ দেখবে নাকি?'

'তাই ব'লে অনিচ্ছায় কাজ করবারও কোনো মানে হয় না। আপনি যান না বাড়িতে—আমি কি মণ্টুকে নিয়ে একা যেতে পারিনে?' আমি অভিমানের অভিনয় করবার লোভ সামলাতে না-পেরে ওর কথাকে ভুল বোঝবার ভাণ ক'রে কথাটা বললুম। এর উত্তরে যা শুনলাম, ততটা আমি আশা করিনি; মুখের

দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনাকে বাদ দিয়ে কোনো আনন্দের কথা গেলো একমাসের মধ্যেও মনে হয়নি আমার।'

গভীর একটা উত্তেজনায় আমার কান গরম হ'য়ে উঠলো—মনে হ'লো, শরীরের সমস্ত রক্ত যেন আশ্রয় নিয়েছে আমার মুখে। এর পরে সিনেমা-গৃহে আসা পর্যন্ত আমাদের আর একটি কথাও হ'লো না। ভিতরে গিয়ে দৈবক্রমে আমাদের পাশাপাশি বসা হ'য়ে গেলো—এর আগে মাঝখানে আমরা মণ্টুকেই শিখণ্ডী রেখেছি—যদিও এই লজ্জা, এই সংকোচ এই আমার প্রথম, কেননা কত দিন কত কারণে কত পুরুষমানুষের পাশে আমি বসেছি এবং পাশাপাশি যে বসেছি, এই চেতনাও আমার কখনো ছিলো না। জায়গা হয়েছে বসেছি—পাশে পুরুষ কি স্ত্রীলোক এই ভেবে কোনো উৎকণ্ঠার যে প্রয়োজন থাকতে পারে এটা আমার বোধগম্য হয়নি কখনো। কিন্তু আজ পাশাপাশি ব'সে আমি ওর অস্তিত্ব আমার শরীরের প্রতিটি অণুপরমাণুতে উপলব্ধি ক'রে শিহরিত হ'তে লাগলাম। দুইটি চেয়ারের মাঝখানের হাতলটিতে একবার ওর হাতের উপর অজান্তে আমি হাত রাখতেই ও চমকে উঠলো—আমি লজ্জায় ম'রে গেলুম, কিন্তু কৈফিয়ৎ দিতে পারলুম না কোনো—নিঃশব্দে ত্রস্তে হাত তুলে নিতেই ও বললো, 'কী হ'লো? রাখুন না আপনি হাত—সুবিধে পাবেন।'

'না, না।'

'বাঃ, না না কেন। আমি হাত তুলে নিচ্ছি—আমি বরং মণ্টুর সঙ্গে শেয়ার করি।'

'না, আমার দরকার নেই কোনো।' এই একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে ও ভয়ানক ছেলেমানুষি করতে লাগলে—অবশেষে বহু কথা-কাটাকাটির পরে আমি হাত রাখলাম সেখানে এবং একটু পরেই ওর বলিষ্ঠ উষ্ণ হাতের স্পর্শে আমার হাত অবশ হ'য়ে এলো।

৭

ছবি শেষ হ'লে যখন বাইরে এলাম আমি আর তাকাতে পারছিলাম না লজ্জায়। বুঝলাম, নিজের অসংযত আচরণে ও অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছে। কিন্তু এটুকুই কি আমাদের পরস্পরের কাছে চরম প্রকাশ নয়?

রাত্রে শুয়ে-শুয়ে কতক্ষণ যে ঘুম এলো না, কতক্ষণ যে সেই হাতের স্পর্শ অনুভব করলুম জানি না—সমস্ত হৃদয়-মন যেন গানের সুরে ভ'রে গেলো।

এর ঠিক দু'দিন পরেই এলো অভিলাষ। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ আশঙ্কায় উদ্বেগে ভ'রে গেলো। সেই দিনই সন্ধেবেলা বাবা এলে ও বললো, 'দেখুন, আপনাদের এই সংস্কার সত্যি আমার ভালো লাগে না। হিন্দু বিবাহের কি কোনো মানে হয়? তাছাড়া অত দেরি আমি করতে

পারবো না। চৈত্র মাস কী আবার—চৈত্র মাসেই বিয়ের ব্যবস্থা করুন।'

আমার বাবা তাঁর ভাবী আই. সি. এস. জামাইয়ের ব্যগ্রতায় খুশিই হলেন বোধহয়। আমি উপস্থিত ছিলাম সেখানে; লক্ষ্য করলাম, আমার দিকে তিনি আড়চোখে তাকালেন। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'তোমার শাশুড়ি হাজার হোক স্ত্রীলোক তো—উনি কিছুতেই চান না যে রেজিস্ট্রি ক'রে বিয়ে হয়—একটাই মেয়ে—একটু ধুমধাম, আমোদ-আহ্লাদ—'

'ধুমধাম আমোদ-আহ্লাদ—ননসেন্স—আপনাদের যত ইয়ে। আমার বাবারও ঐ কথা। বেশ তো, করুন গিয়ে ধুমধাম, কিন্তু চৈত্র মাসে বিয়েতে বাধাটা কী?'

'চৈত্র মাসে?'—এবার বাবার নিজেরই বোধহয় খটকা হ'লো। একটু ইতস্তত ক'রে বললেন, 'এতদিনই গেলো যখন, তখন যাক না আর একটা মাস।'—ভয়ে-ভয়ে তিনি তাকালেন অভিলাষের দিকে।

অভিলাষের লজ্জা ব'লে পদার্থ নেই, আই. সি. এস. হ'য়ে ও ধরাকে সরা জ্ঞান করছে—লঘুগুরু ভেদ ভুলে গেছে। রাগ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি একমাসও সবুর করতে রাজি নই সে-কথা কতবার বলবো। এর পর আপনাদের ইচ্ছা।'—উত্তরের অপেক্ষা না-ক'রে সে সাহেবি কায়দায় পা ফেলে বেরিয়ে গেলো।

বাবা দুঃখিত হলেন ওর ব্যবহারে, অথচ সেটা লুকোবার যথেষ্ট চেষ্টা ক'রে বললেন, 'অভিলাষ যা বলে সেটা সত্যিই। আমাদের যত সব সংস্কার! এ-সব সংস্কার কি আজকালকার ছেলেদের ভালো লাগে?'

আমি চুপ ক'রে রইলাম। একটু পরে মা ঘরে ঢুকতেই বাবা আমাকে বাইরে যেতে বললেন। আমি বুঝলাম, চৈত্র মাসেই আমার ফাঁসির ব্যবস্থার পরামর্শ। আমি নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিলাম, অভিলাষ সাড়া পেয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলো—দাড়ি কামাচ্ছিলো, আদ্ধেক গালে সাবান, আদ্ধেক গাল কামানো। কাছাকাছি এসে আমার হাতে ভয়ানক জোরে একটা চাপ দিয়ে বললো, 'আচ্ছা, তুমিই বলো তো, এ-সমস্ত ব্যাপারে আমার মেজাজ ঠিক রাখা সম্ভব কিনা?'

'কী জানি, আমি কী ক'রে বলবো, আপাতত আমার হাতটা ছেড়ে দাও দয়া ক'রে।'

'কেন?'

'গায়ে হাত না-দিয়ে কি কথা বলা যায় না?'

মুখে যথাসম্ভব মধুরতা ছড়িয়ে বললো, 'যায় বইকি—আমি কি তোমার বাবার গায়ে হাত দিয়ে কথা বলি? কিন্তু তাঁর কন্যার বেলায় আলাদা ব্যবস্থা।'

'আশা করি সুযোগ পেলে অনেক বাবার অনেক কন্যার বেলায়ই এ-ব্যবস্থা খাটে?'

'তা হ'তে পারে—কিন্তু বর্তমানে একজন বাবার একমাত্র কন্যার গায়ে হাত দেবার আমার প্রচুর লোভ আছে।'

'বেশ তো! সে-ব্যবস্থা তো হচ্ছেই—এখন আমাকে ছেড়ে দাও।'

'কী আশ্চর্য, রুনি—আগে তো তুমি আমার উপর এত নিষ্ঠুর ছিলে না।'

ফশ ক'রে ব'লে ফেললুম, 'আগে তুমি এতটা বদ ছিলে না।'

'রুনি!'

আমি আর জবাব না-দিয়ে গম্ভীরভাবে চ'লে গেলুম সেখান থেকে। সোজা ঘরে এসে বসতে-না-বসতেই দরজার বাইরে আবার অভিলাষের গলা শুনতে পেলাম, 'ভিতরে আসবো?'

আমি বিরক্ত হ'য়ে জবাব দিলুম, 'না।'

কিন্তু অভিলাষ সে-কথা শুনলো না, পরদা সরিয়ে ভিতরে এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো, 'রুনি, কেন তুমি আমার সঙ্গে এ-রকম ব্যবহার করো? যা খুশি তাই বলো? অসম্মান অবহেলা কী তুমি করো না বলো তো?'

বিনা অনুমতিতে ঘরে ঢোকবার অপরাধ ভুলে গেলুম ওর কোমল কথায়। আমরা মেয়েরা এত সেন্টিমেন্টাল আর এত বিশ্বাস করতে ভালোবাসি ব'লেই পুরুষেরা আমাদের অত ভুলিয়ে

বেড়ায়। নিজের নিষ্ঠুরতায় কষ্ট হ'লো। মুখের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'অভিলাষ, তুমি আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু—তোমাকে দুঃখ দিতে আমারও কি ভালো লাগে? কিন্তু তুমি সত্যি বড়ো বাড়াবাড়ি করো।'

'কী বাড়াবাড়ি করি?'

'কী করো তার তালিকা দেয়া হয়তো কঠিন, কিন্তু তোমার ভাব-স্বভাবই আমার ভালো লাগে না। বলতে পারো আমার মাকে তুমি ও-রকম একটা চিঠি লিখেছিলে কেন? এটা কি তোমার উচিত হয়েছে?'

'উচিত অনুচিত জানিনে—আমার মতে তোমাকে স্ট্রিক্ট ডিসিপ্লিনে রাখাই এখন কর্তব্য। তুমি পথভ্রষ্ট হচ্ছো। শয়তান তোমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।'

'তোমার মুণ্ডু!' রেগে আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। 'স্পষ্ট ক'রে বলাই ভালো অভিলাষ, বিয়ে আমি তোমাকে কখনোই করবো না—কেটে ফেললেও না।'

'নিশ্চয়ই করবে।' রুখে উঠলো অভিলাষ।

'জোর করবে—মারবে—না মুখে কাপড় বেঁধে বিবাহ-সভায় বসাবে! আমি কচি খুকি নই, অভিলাষ—তোমার মতো রোগ্‌কে আমি চিনতে পারি।'

'চিনতে পারো? বেশ, দেখা যাবে আমার হাত থেকে তুমি ছাড়া পাও কিনা—একমাসের মধ্যে তোমাকে আমি

বিয়ে না করি তো আমার নাম অভিলাষ দত্ত নয়, এই আমি তোমাকে ব'লে গেলুম।'—রাগে গরগর করতে-করতে ও বেরিয়ে গেলো।

আমি কী করি। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম, কী করি, আমি কী করি।

খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, পাগলের মতো আমি উপায় ঠাওরাতে লাগলাম—কী উপায়ে ওর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

অভিলাষ তিন দিন থেকে চ'লে গেলো, কিন্তু আমার ভাবনা ঘুচলো না। আমি জানি এঁরা চৈত্র মাসেই আমার বিয়ে দেবেন। অভিলাষ যখন জেদ ধরেছে আমার বাবা তা নিশ্চয়ই পূরণ করবেন। বামুনদের শাস্ত্র বার করতে আর দেরি হবে না। আশ্চর্য এই—আমার যে এমন অবস্থা—খেতে পারি না, ঘুমুতে পারি না, ভাতে হাতে দিলেই বমি আসতে চায়, এ-জন্য আমার মা বাবা একবারও জিজ্ঞাসা করলেন না কী হয়েছে। চেহারার যা হাল হ'লো তা আয়নায় দেখে নিজেই শিহরিত হলুম। এ-যন্ত্রণা আর সইতে না-পেরে একদিন সন্ধ্যাবেলা মার কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লুম, 'মা, আমাকে কি তোমরা সত্যিই অভিলাষের সঙ্গে বিয়ে দেবে?'

মার মুখ কঠিন হ'য়ে উঠলো; গম্ভীরমুখে বললেন, 'তোমার কী ইচ্ছে?'

'কক্ষনো না, মা, কক্ষনো না—তোমার পায়ে পড়ি, মা, ওর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও। তোমরা জানো না, ও দস্যু, ও একটা বদমাস।'

'ন্যাকামি কোরো না, রুনি, এখান থেকে যাও। আমরা জানি ও বদমাস নয়—তা হ'লে ও তোমাকে বিয়ে করতো না—আর ও যদি বদ হয় তবে তুমিই বা আমার পেটের সন্তান হ'য়ে নির্দোষ হ'লে না কেন? তুমি ভেবো না এই ঘটনা আমার পক্ষে কম দুঃখের হয়েছে।'

'কী বলছো মা, তুমি? যদি এই বিয়ে তোমার পক্ষে আনন্দের না হবে তবে কেন আমাকে হত্যা করবার এই অপরূপ ব্যবস্থা করেছো?'

'বিয়েতে আমার অমত আছে তা তো আমি বলিনি। খুব মত আছে, যথেষ্ট ইচ্ছা আছে, কিন্তু—তোমার প্রবৃত্তিতে আমি কষ্ট পেয়েছি। আমি আশা করিনি আমার সন্তান এ-কাজ করতে পারে।'

'খুলে বলো, মা, কী হয়েছে—কী আমি করেছি।' মা চুপ ক'রে রইলেন, একটু পরে বললেন, 'চৈত্র মাসেই তোমার বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। এর মধ্যে চেষ্টা ক'রে শরীরটা একটু অন্তত সারিয়ে নাও—লোকের কাছে কেলেঙ্কারি ক'রে লাভ কী!'

আমি বিমূঢ় দৃষ্টিতে মার দিকে তাকিয়ে রইলাম—বুঝতে

পারলাম না, মা কী বলতে চান। মার বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ আমাকে ভাবিয়ে তুললো। অভিলাষের এ কোন নতুন ফন্দি, কী বিষ সে ঢেলে গেলো কে জানে।

চুপচাপ উঠে এলাম। মনটা বড়ো অস্থির বোধ করতে লাগলাম। ওর কাছে কি একবার যাওয়া যায় না? অভিলাষের হাত থেকে ও কি মুক্তি দিতে পারে না আমাকে?

আমি ছটফট করতে লাগলাম আমার ঘরে। রাত বেশি হয়নি—বাবা গেছেন ব্রিজের আড্ডায়—জানলা দিয়ে দেখলাম মার ঘরে নীল আলো জ্বলছে—আমি আমার ঘরের দরজা ভেজিয়ে অতি সন্তর্পণে নিচে নেমে এলাম—এবং একান্ত অনভ্যস্ত পায়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।

যখন দোকানে গিয়ে পৌঁছলাম তখন আমার হুঁশ হ'লো। এটা ভালো হ'লো না—এই রাত ক'রে আবার আমি কেমন ক'রে ফিরে যাবো। কিন্তু মনের বাষ্প আমাকে আমার অবচেতনেই এখানে উড়িয়ে এনে ফেলেছে।

দোকানে ঢুকতেই চোখাচোখি হ'লো—দোকান ভর্তি লোকজন—কেনা-কাটা চলছে, আমি যেতেই সকলের একটা সন্ত্রস্ত ভাব এলো। আমি সেখানে দাঁড়াতেই ও উঠে এলো এবং আমাকে নিয়ে বাইরে আসতে-আসতে বললো, 'আমাদের অন্দরের আর-একটা দরজা আছে—চলুন সেখান দিয়ে যাই।'

আমার মন অত্যন্ত অস্থির ছিল, তবুও আমি হেসে ওকে বললুম, 'আমি এসেছি জিনিশ কিনতে, অন্দরের দরজা দিয়ে ঢুকলে কি আমার সুবিধে হবে ?'

মৃদু হেসে ও বললো 'আমার তো তা-ই মনে হয়।'

'মোটেও না।'

'দেখাই যাক—' অতি মন্থর গতিতে ও পা চালালো। পাশ দিয়েই দরজা, কিন্তু আমি বুঝলাম ঐ দরজায় পৌঁছতে ওর অনেক সময় লাগবে। 'আমি একটা দরকারে এসেছি', আমি বললুম।

'এতদিন কি সমস্ত দরকার চুকে গিয়েছিলো ?'

'এতদিন! এতদিন কোথায়—সাত-আট দিন তো মোটে আসিনি—'

'সাত-আট মিনিটেরও যেটা পথ নয়, সেখানে কি সাত-আট দিনেরও অনুপস্থিতি সুখের হয় ?'

'না, সে-কথা বললে নিতান্তই সত্যের অপলাপ করা হবে—তবে আর-একজন মানুষের সুবিধেও তো আমার দেখা দরকার।'

'সে-মানুষটি কে ? আমি, না অভিলাষ ?'

আমি চকিতে মুখের দিকে তাকালুম, তখুনি সামলে নিয়ে বললুম, 'এখানে আর তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নেই—এ কেবল আমার আর আপনার কথাই হচ্ছে।'

'আমার মতো অভাজনেরও তাহ'লে—'

'কী ফাজলেমি !—আমার মন আজ অত্যন্ত বিচলিত।'

'কেন বলুন তো ?'

বলতে আমার মুখে আটকালো—একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'আচ্ছা, এমন যদি কখনো হয় যে নিজেকে বাঁচাবার জন্য আমি আপনার শরণাপন্ন হই—আর তার মধ্যে যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা থাকে—তাহ'লে কি আপনি আমাকে রক্ষা করবেন ?'

'সে তো ভারি মুশকিল—আমি কি ডাক্তারি জানি যে বাঁচাতে পারবো।'

এবার আমি রাগ করলাম। বোঝেনি নাকি ? সমস্ত বুঝেছে !

'চুপ করলেন যে ?'

'কী করবো ?'

'আমাকে আদেশ করুন।'

আমি দুঃখিত হ'য়ে বললাম, 'আপনি আমার বিপদ সমস্তই জানেন—অভিলাষ নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে দেখা করেছিলো।'

'তা তো করেছিলো, কিন্তু তাতে বিপদটা কী, তা আমি জানি না।'

'অভিলাষ বলেনি আপনাকে—' এখানে আমি থামলাম।' এবার ও গম্ভীর হ'য়ে বললো, 'হ্যাঁ—আর পনেরো দিন বাকি আছে আপনাদের বিয়ের।'

'পনেরো দিন ?'

'কেন, এ-কথা সত্য নয় ?'

'হয়তো সত্য, আমি জানিনে। আমার বিয়ের কর্তা তো আমি নই।'

'ও।'

'আপনি কি এতদিনেও বুঝলেন না এ-বিয়েতে আমার সম্মতি নেই ?'

'বুঝেছি।'

'আমি সে-কথাই বলছিলাম—আমাকে রক্ষা করুন আপনি—যে ক'রে হোক আমাকে রক্ষা করুন।'

ও হেসে বললো, 'কী আশ্চর্য! এ-কথা আপনার বাপ-মাকে বলুন—তা হ'লেই তো চুকে যায়।'

'চুকে যায়—? আপনি কি ভুলে যাচ্ছেন যে অভিলাষ কত বড়ো সুপাত্র ? ওঁরা হবেন আই. সি. এস-এর শ্বশুর-শাশুড়ি, ওঁদের টাকা আছে, সমাজে ওঁদের মান কত। সে-মান কি ওঁরা বজায় রাখবেন না ? আজ যদি এ-জামাই ফশকায়—তবে যোগ্য পাত্রের জন্য আবার কতকাল অপেক্ষা করতে হবে তা কি জানেন ?'

'তাই ব'লে আপনার অমতে হবে ?'

'নিশ্চয়ই! আমি কী বুঝি, আমার আবার সুখ-দুঃখ কী—' বলতে-বলতে আমার চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলো।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললো, 'তুমি কি সত্যি বলছো? সত্যি তুমি আসবে আমার মতো দরিদ্রের গৃহে?'

বিয়ে? আমি যেন চমকে উঠলাম। কত আমার বুদ্ধি কম, কী ছেলেমানুষ আমি! আমি তো এ-কথাটাই ভাবিনি যে তার পক্ষে আমাকে অভিলাষের হাত থেকে বাঁচানো মানেই বিয়ে করা—এ ছাড়া সে কী করতে পারে?

আমি আগাগোড়াই ভেবেছি, সে সব পারবে—অভিলাষের কবল থেকে অনায়াসে আমাকে রক্ষা করতে পারবে, কিন্তু সেটা যে একমাত্র বিবাহের দ্বারাই হ'তে পারে এ-কথাটা এর আগে আমার মাথায় আসেনি—লজ্জায় লাল হ'য়ে মাথা নিচু ক'রে বললাম, 'এ-কথা তো আমি ভাবিনি।'

গম্ভীর হ'য়ে বললো, 'তাহ'লে কী ভেবেছেন?'

'কী ভেবেছি আমি জানি না, আমাকে ক্ষমা করুন।'

ওর মুখে বিদ্রূপের হাসি খেলে গেলো। 'ক্ষমা আবার করবো কী জন্য—কী করেছেন আপনি? তবে আপনার ভালোর জন্যই বলছি, এ-দেশটা এখনো তো এমন হ'য়ে ওঠেনি যাতে বিয়ে না-ক'রেও নিষিদ্ধ সময়ে বা লুকিয়ে দেখাশোনা করলে কথা হবে না; কাজেই মন যদ্দিন আপনার স্থির না হয় তদ্দিন আপনি বরং আর আমাকে

দেখা না দিলেন। আমি বলি, অভিলাষকেই বিয়ে করুন—বিয়ের পরে দেখবেন—অন্য দুঃখ আর দুঃখ নেই—টাকাই সুখ, টাকাই শান্তি! চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

আমার মাথায় যদি বজ্রপতন হ'তো, তবুও বোধহয় হঠাৎ এমন জড়পদার্থে পরিণত হ'য়ে যেতে পারতাম না; আমার হাত পা জিভ সব যেন একসঙ্গে পাথরের মতো ভারি হ'য়ে গেলো।

বাড়ি ঢোকবার দরজার মুখে দাঁড়িয়েই আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম—আমি দরজায় ঠেশ দিয়ে নিজের ভার সামলালুম। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে বললুম, 'তাহ'লে তুমিও আমাকে ত্যাগ করলে?'

'আমি নগণ্য, আমি দরিদ্র—'বলতে-বলতে ওর গলা ভেঙে গেলো। আমি অধীর আগ্রহে ওর হাত দুটো চেপে ধ'রে বললাম, 'তুমি মহৎ; তুমি রাজা—আমার মতো একটা মানুষকে তুমি আশ্রয় দেবে না? আমাকে ভুল বুঝে ঠেলে দেবে?'

হঠাৎ ওর মা-র ডাক শুনে দু'জনেই একসঙ্গে চমকে উঠলাম—'তুমি দাঁড়াও, আমি আসছি,' ব'লে ও দ্রুতপদে চ'লে গেলো ভিতরে, একটু পরেই বেরিয়ে এসে বললো, 'চলো।'

যেতে-যেতে বললো, 'কাল কি একবার আসতে পারো না?'

'কী ক'রে বলবো? আজ যখন আমি এলাম তখন আমার মধ্যে আমি ছিলাম না, তাহ'লে কি আসতে পারতাম? ফিরে গিয়ে কোন তোপের মুখে পড়বো কে জানে।'

'কিন্তু তোমার সঙ্গে যে আমার কথা ছিলো।'

'কথা আমারও আছে। কিন্তু আজকের জল কোথায় গড়াবে তা যে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কাছে স'রে এসে আমার পিঠে হাত রেখে বললো, 'কিছু ভেবো না তুমি—কী ওদের সাধ্য তোমাকে কষ্ট দেবে। আমি যাবো তোমার বাবার কাছে।'

আমি আর্তস্বরে ব'লে উঠলাম, 'বাবার কাছে! বাবার কাছে কেন?'

'যাবো না? তাঁকে তো জানাতে হবে?'

'অসম্ভব—আপনি কি অপমানিত না-হ'য়ে ছাড়বেন না?'

'অপমান আবার কী? তোমাকে চাইতে যাবো—এর তুল্য সম্মান আমার জীবনে আর আছে নাকি?'

'বাবা অমনি ইচ্ছা পূরণ করবেন এই কি আপনি ভাবেন?'

'আরে না না—তোমার বাবা যে সে-পাত্র নন, তা আমি বুঝি, কিন্তু একেবারে না-জানিয়েও তো হ'তে পারে না। আমি বলবো; ওঁরা যদি রাজি হন ভালো, নয়তো পৃথ্বীরাজের মতো তোমাকে হরণ ক'রেই নিয়ে আনতে হবে ক্ষুদ্র কুটিরে। কিন্তু রানীর মন সেখানে টি`কবে তো?'

আমি ঠাট্টার জবাব দিলাম না—মনটা কেমন খারাপ হ'য়ে গেলো।

'চুপ ক'রে রইলে যে?'

'কী বলবো।'

'বলবার কি কিছুই নেই?'

'অনেক আছে—এত আছে যে সমস্ত জীবন ধ'রে সমস্ত দিন-রাত ভ'রে বললেও তা শেষ হবে না—আপনি কি বোঝেন না কিছু? কিন্তু এ-বুদ্ধিটা আমার ভালো লাগছে না।'

'শোনো, তোমাকে প্রথমেই দুটো কথা ব'লে নিই, তারপর এর জবাব দেবো। প্রথম হচ্ছে তুমি আমাকে আপনি বলছো কেন? আমি কি তোমার আপনি? আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে—তুমি তো সত্যিই রানী—তোমার মতো মেয়ে যদি রানী না হয় তবে আর রানী কে। সংসারে যত মেয়ে দেখলুম, একমাত্র মেয়ে তুমিই—যাকে দেখলেই রানী বলতে ইচ্ছে করে—কাজেই তোমাকে রুনি বলতে আমি পারবো না। তারপর শোনো—আমি যদি তোমার বাবাকে কিছু না-ব'লে লুকিয়ে বিয়ে করি সেটা আমার পক্ষে মর্মান্তিক হবে।—আমি আনবো তোমাকে জয় ক'রে—আমার আপন অধিকারে আমি তোমাকে কেড়ে আনবো, লুকিয়ে নয়। আচ্ছা রানী, আমাকে কি তুমি এতই কাপুরুষ ভাবো?'

ওর কথা শুনতে-শুনতে আমার হৃদয় লঘু হ'য়ে এলো—জোর পেলাম মনে—ভাবলাম ভয় কী, দুঃখ কী—আমরা জয়ী হবো।

বাড়ির কাছাকাছি এসে ও থমকে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি এখান থেকেই ফিরে যাই—' হাত বাড়িয়ে দিলো আমার দিকে—আমি সে-হাত নিজের মুঠোর মধ্যে একবার নিয়েই ছেড়ে দিলুম।

বাড়িতে ঢুকলাম সন্তর্পণে—থমথম করছে বাড়ি-ঘর—হাতঘড়িতে তাকিয়ে দেখলুম ন'টা। আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠেই মার মুখোমুখি প'ড়ে থতমত খেয়ে গেলুম। গম্ভীর মুখে মা বললেন, 'গিয়েছিলে কোথায় ?'

পরিষ্কার জবাব দিলুম, 'মনোহারি দোকানে।'

'কেন ?'

'দরকার ছিলো।'

'কী দরকার জানতে পারি কি ?'

উদ্ধতভাবে বললুম, 'নিশ্চয়ই।'

'রুনি !'

'শোনো তবে শেষ কথা—অভিলাষকে আমি কক্ষনো বিয়ে করবো না—জোর কোরো না তোমরা—যদি করো, আমি আর এক দণ্ড এ-বাড়িতে থাকবো না।'

'যাবে কোন চুলোয়—দোকানির কাছে ?'

এ-কথা বলবার সময় মার অমন সুন্দর মুখ কী যে কুৎসিত দেখালো তা আমি বলতে পারবো না। আহত হ'য়ে বললাম, 'মা, তোমার স্বামী বড়োলোক হ'তে পারেন—তোমার বাবা তো, মা, দরিদ্র ছিলেন। তোমার মেয়ের বেলায় না-হয় তার উল্টোটা হোক।'

মা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি পাশ কাটিয়ে ঘরে চ'লে গেলাম।

ঘরে ফিরে ইজিচেয়ারে লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়লাম—সঙ্গে-সঙ্গে ক্লান্তিতে সমস্ত চোখ ছেয়ে ঘুম এলো। সে-রাত্রে কেউ আমাকে খেতে ডাকলো না—বিরক্ত করলো না। ঘুম ভাঙলো প্রায় শেষ রাত্রে—সারা রাত প'ড়ে ছিলাম ইজিচেয়ারে, আড়মোড়া ভেঙে উঠে বিছানায় আসছিলাম, হঠাৎ মার ঘরে মৃদু কথোপকথনে কান খাড়া হ'য়ে উঠলো। একেবারে জানলার পাশে গিয়ে কান পাততেই শুনলাম মার কথা, 'কী হয় গরিব হ'লে? আমার বাবা গরিব ছিলেন, তাই ব'লে আমার মা তো অসুখী ছিলেন না। বিয়েতে যখন ওর এত আপত্তি তখন কেনই বা আমাদের জোর করা—দ্যাখো, এ-মেয়ে ভাঙবে তো মচকাবে না, অনর্থক—'

'চুপ করো তুমি—'বাবা চাপা গর্জনে মাকে ধমকে উঠলেন, 'লজ্জা করে না স্ত্রীলোক হ'য়ে এই পাপের প্রশ্রয় দিতে? তোমার মুখ থেকে যদি মেয়ের সপক্ষে আর-একটি কথা

বেরোয়, জেনে রেখো তাতে মা-মেয়ে কারুরই ভালো হবে না। ঐ বদমাসের দোকান আমি উঠিয়ে ছাড়বো। ঐ স্কাউণ্ড্রেলই ওকে অধঃপতনের পথে এমন ক'রে টেনে নিয়ে গেলো।'

এর বেশি শোনবার আমার দরকার হ'লো না—স্খলিত পায়ে বিছানায় এসে ভেঙে পড়লাম।

পরের দিন যে কী-ভাবে কেটেছিলো তা আর ভাবতে পারি না এখন। সকাল থেকে চেষ্টা করতে লাগলাম, একবার কোনোরকমে পালাতে পারি কিনা—মন আকুল হ'য়ে উঠলো ওর জন্য।

হায় হায়—কেন এই বিপদে ফেললাম ওকে। হোক আমার বিয়ে—যাক জীবন তিলে-তিলে ক্ষ'য়ে। কিন্তু হে ভগবান, ওকে তুমি দয়া করো, দয়া করো।

বিকেলবেলা মা এলেন ঘরে, বললেন, 'শুয়ে আছিস এখনো? উঠে আয়—আয় মা, আয়।' মা সস্নেহে আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার কিছু করবার পথ তো তুই রাখিসনি, রুনি—নিজের পায়ে তুই নিজে কুড়ুল দিলি। এখন যদি বিয়ে না করিস স্ত্রীলোকের পক্ষে তার চেয়ে বড়ো কলঙ্ক আর কী হ'তে পারে বলতে পারিস আমাকে?'

মার কথার ধরনে আমি চমকে উঠলাম, এবং মুহূর্তে আমার বুকের মধ্যে বিদ্যুতের মতো যে-কথা খেলে গেলো

তাতে আমার দম বন্ধ হ'য়ে এলো। এরা কী ভেবেছে? কী ভেবেছে এরা—আমার কান গরম হ'য়ে উঠলো—মুখ তুলে কথা বলতে চেষ্টা করলাম মার সঙ্গে, বন্ধ হ'লো গলা। মা আমাকে কথা বলবার অবসর দিলেন না—বাবার ডাকে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

আমি অধীর আগ্রহে আবার মার সঙ্গে দেখা হবার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম, কিন্তু মার দেখা পেলাম না—আর সন্ধের পরে যিনি ঘরে এলেন তাঁকে দেখে আমার মনের অবস্থা এমন হ'লো যে স্বয়ং যম দেখেও মানুষ অমন আঁৎকে ওঠে না।

অভিলাষকে নিয়ে বাবাই এ-ঘরে এসেছিলেন—আমাকে বললেন, 'রুনি, অভি তোর সঙ্গে কথা বলতে চায়।' এই ব'লে তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং ব'লে গেলেন, 'এক্ষুনি আসছি।' বলাই বাহুল্য, অভিলাষই প্রথম কথা বললো, 'তুমি বোধহয় জানো না যে কাল সকালেই আমাদের রেজিস্ট্রেশন হবে। আমি তোমার বাবার টেলিগ্রাম পেয়েই চ'লে এসেছি।'

আমি কথা বললাম না।

'তোমার কি বলবার কিছু আছে?'

'না।'

'তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে?'

'না।'

'অমন চেহারা হয়েছে কেন ?'

'জানি না।'

'আমার সঙ্গে বাক্যালাপেও রুচি নেই দেখছি।'

আমি এবার বললাম 'আর-কোনো কথা আছে ?'

'আছে বইকি—শুনছে কে।'

'তবে আর ব'সে থাকা কেন!'

'বাঃ, সুন্দর জিনিশ দেখতে ইচ্ছে করে না ?'

আমি এবার উঠে দাঁড়ালাম, কিন্তু দরজার ধারে যেতেই ও আমার আঁচল টেনে ধরলো এবং ধরবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমি চীৎকার ক'রে প'ড়ে গেলাম মেঝের উপর।

শব্দ পেয়ে মা ছুটে এলেন, চাকররা এলো। আমার মা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে অভিলাষের দিকে তাকিয়ে আমাকে বুকে ক'রে তুলে শুইয়ে দিলেন বিছানায়। তারপর মাথায় হাওয়া করতে লাগলেন। অনেক দিন পরে মার সস্নেহ স্পর্শ পেয়ে আকুল হ'য়ে আমি কাঁদতে লাগলাম তাঁর কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে অভিলাষ অপরাধীর মতো বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। মা উঠে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এলেন। একটু পরে আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'একটা সত্যি কথা বলবি মা, একটুও লজ্জা করিসনে, লুকোসনে—মনে রাখিস আমি তোর মা—আমিই সংসারে একমাত্র তোর সুখ-দুঃখের ভাগী।'

আমি উৎসুক দৃষ্টিতে মার দিকে তাকিয়ে রইলাম। মা বললেন, 'সত্যি ক'রে বল তো কদ্দিন হয়েছে?'

'কী কদ্দিন হয়েছে, মা?'

'রুনি, আমাকে লুকোসনে,—আমি তোর ভালোর জন্যই বলছি। তোর চোখের নিচে কালি—তোর শরীর খারাপ—খেতে পারিস না—আমিও সন্তানের মা—আমাকে কি ফাঁকি দিতে পারবি?'

'মা!' আমি তীব্রস্বরে ব'লে উঠলাম, 'তুমি আমার মা হ'য়ে আমাকে এত বড়ো অপমান করতে পারলে!'

স্খলিত কণ্ঠে মা বললেন, 'অপমান? এ কি তবে মিথ্যে কথা?'

আমি উত্তেজনায় বিছানা থেকে উঠে বসলাম, সজোরে মার হাত মুচড়ে দিতে-দিতে বলতে লাগলাম, 'এত বড়ো অপমান কেন করলে? কেন তুমি এত বড়ো অপমান করলে আমাকে?'

মা হতভম্বের মতো তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তবে যে অভিলাষ বলছিলো?'

'বলেছিলো অভিলাষ?'

'হ্যাঁ, বলেছে—'

'বলো মা, খুলে বলো। সব খুলে বলো। শয়তান, শয়তান! ওর গলা টিপে মারবো আমি—কেটে ওকে দু'টুকরো করবো।'

মা বললেন, ‘এর আগের বার যাবার আগেই—ও আমাকে চুপি-চুপি ডেকে নিয়ে প্রথমেই পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাইলো, তারপর বললো, চৈত্র মাসেই বিয়ে না-হ’লে লজ্জায় পড়তে হবে।’

আমি মার মুখে হাত চাপা দিয়ে বললুম—‘বোলো না, মা, আর বোলো না—মা হ’য়ে তুমি এ-কথা বিশ্বাস করলে? একবার জিজ্ঞাসা করলে না আমাকে? আমাকে তোমার এত অবিশ্বাস? এত অবহেলা?’

আমি আচ্ছন্নের মতো শুয়ে পড়লাম। দুঃখে, ক্ষোভে উত্তেজনায় মনে হ’লো আমি এখনি হার্টফেল ক’রে ম’রে যাবো।

অনেকক্ষণ পরে মা আস্তে-আস্তে অপরাধীর কণ্ঠে বললেন, ‘আমি ভুল করেছিলাম, মানুষ যে এত নীচ হ’তে পারে তা আমার জানা ছিলো না—এ-ক’দিন আমার মনের উপরও কম যায়নি, রুনি। তুই ঠিকই বলেছিলি—গরিব বাপের মেয়ে আমি—আর সত্যি বলতে, আমার বাবার হাতে প’ড়ে আমার মা যত সুখী ছিলেন আমি তার অর্ধেক সুখীও প্রথম জীবনে হইনি। তুই এলি, আর সংসারে নামলো শান্তির ধারা, তোর বাবা শুধরে গেলেন। আমার বুক ভ’রে গেলো তোর স্নেহে।’

মার চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলো। একটু পরে বললেন, ‘রুনি, আমি কক্ষনো অভিলাষের হাতে তোকে

দেবো না—ওর আরেকটা ঘটনাও দু'একদিন আগে শুনলাম—ও সত্যিই বদ—তোর বাবা বলেন পুরুষের নৈতিক দোষ দোষ নয়—কিন্তু আমি জানি স্বামীর চরিত্রে এ-খুঁত স্ত্রীলোকের জীবনকে সবচেয়ে বেশি বিষময় ক'রে তোলে। এ নিয়ে তোর বাবার সঙ্গে আমি ঝগড়া করি না, কেননা এখানেই আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো দুঃখ ছিলো এক সময়ে।

'এতদিন আমি অভিলাষকে সত্যিই ভালো ব'লে জানতাম—কিন্তু সেদিনের পর থেকে আমার মন কেমন বিমুখ হ'য়ে গেলো। তোর উপরও কম অভিমান হয়নি।—যখন বললি বিয়ে করবি না তখন যেন আমার তোকে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছিলো।'

একদমে মা অনেক কথা ব'লে হাঁপাতে লাগলেন। আমি নিঃশব্দে প'ড়ে রইলাম মুখ গুঁজে।

রাত্রে সকলেই একসঙ্গে খেতে বসলাম। খেতে-খেতে হঠাৎ মা বললেন, 'অভিলাষ, কিছু মনে কোরো না বাবা, আমার ইচ্ছে নয় রুনির সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়।'

বাবা আকাশ থেকে পড়লেন, হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলেন মার দিকে।

অভিলাষের মুখ পাংশু হ'য়ে গেলো।

বলা বাহুল্য, এর পরে অতিশয় নিঃশব্দে আমাদের খাওয়া-

দাওয়া সারা হ'লো। খেয়ে উঠে অভিলাষ বললো, 'আজ রাত্রিটা এখানে থাকলে আশা করি আপনাদের আপত্তি হবে না।'

বাবা মার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বললেন, 'অবশ্যই থাকবে, তোমার সঙ্গে আমার তো কোনো কথা হয়নি। এ-বাড়িতে প্রতিটি ধূলিকণা পর্যন্ত আমার বশ—আমি ছাড়া এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ নেই যে কোনো কথা বললে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি তা মেনে নেবে।'—বাবা রাগে গরগর করতে-করতে অভিলাষের হাত ধ'রে তাকে উপরে নিয়ে গেলেন।

আমি আর মা কিছুক্ষণ ব'সে রইলাম চুপ ক'রে, তারপর মা নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে বললেন, 'রুনি, তোর বাবা এবার স্বমূর্তি ধরেছেন—তিনি যে একটা হেস্তনেস্ত না-ক'রে ছাড়বেন তা আমার মনে হয় না। ভাবিসনে তুই—আমার জীবন থাকতে আমি ঐ অপদার্থের হাতে তোকে তুলে দেবো না।'

আমি নিঃশব্দেই ব'সে রইলাম।

## ৮

পরের দিন সকালবেলা চা খেতে ব'সে অভিলাষ বললো, 'রুনি, তুমি বোধ হয় জানো যে তোমার বাবা আজকেই আমাদের রেজিস্টি, করবার সংকল্প করেছিলেন, কিন্তু ভেবে দেখলাম তাতে

তোমাকে নিতান্তই জবরদস্তি করা হয়। আমি আজ চ'লে যাচ্ছি—ভালো ক'রে তুমি ভেবে দেখ।'

বুঝলাম বাবার সঙ্গে এ-রকমই কোনো পরামর্শ হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে অভিলাষ চ'লে গেলো এবং যাবার মুখে মাকে প্রণাম করতে গিয়ে সে কেঁদে ফেললো। মার হৃদয় জয় করা যে কত সহজ তা সে জানতো—ছলাকলারও তার অভাব ছিলো না। মা মুখ ফেরালেন—সত্যিই হয়তো তাঁর খারাপ লাগছিলো। অভিলাষের সঙ্গে আমার এই সম্বন্ধ এঁদের মনে এমন ভাবেই মিশে গিয়েছিল যে শত দোষ সত্ত্বেও ওকে ত্যাগ করতে এঁদের হৃদয়ে আঘাত লাগা স্বাভাবিক। আমি জানালা দিয়ে ওর বিদায়-দৃশ্য দেখলাম।

এর পরে কয়েক দিন পর্যন্ত বাবা একেবারে গুম হ'য়ে রইলেন। মার সঙ্গে পর্যন্ত কথা বললেন না।

অভিলাষ চ'লে যাবার পরেই আমি মণ্টুকে দিয়ে দোকানে ছোট্ট এক চিঠি পাঠালাম, 'আমার সঙ্গে আবার দেখা না-হওয়া পর্যন্ত তুমি বাবার সঙ্গে কোনো কথা বলতে এসো না। আশা করি ভালো আছো।'

দিন কয়েক কাটলো একটা চাপা অশান্তিতে, তারপর আস্তে আস্তে হাওয়া যখন একটু লঘু হ'য়ে এসেছে এমন দিনে মণ্টু এসে বিষণ্ণ মুখে বললো, 'দিদি, শ্যামল-দার খুব অসুখ। আমি গিয়েছিলাম সেখানে।' বলাই বাহুল্য—আমি ছিলাম

বন্দিনী। দোকানদারের সঙ্গে দেখাশোনা হোক এতে কেবলমাত্র আমার বাবারই নয়—এতে আমার মার মনেও ঘোর আপত্তি ছিলো। বেরুবার পথ আমার একেবারেই বন্ধ। বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি গেলে বাবা নিয়ে যান—নিজেই ফিরিয়ে আনেন। মণ্টুর খবরে আমি বিচলিত হলাম। অশান্ত পায়ে ঘরের এদিক থেকে ওদিক হাঁটতে লাগলাম। মণ্টু বললো, 'বাবা বলেছেন, বাড়ি থেকে যেন এক পা না বেরুই। সেদিন দোকানে গিয়েছি—হঠাৎ দেখি বাবাও সেখানে গেছেন।'

'বাবা!' আমি চমকে উঠলাম। 'বাবা গিয়েছিলেন? সত্যি? তুই জানিস?'

'হ্যাঁ—আমাকে দেখে বাবা রেগে আগুন হ'য়ে গেলেন। তারপর শ্যামল-দার দিকে তাকিয়ে বললেন, "দোকান কি আপনার?" শ্যামল-দা মাথা নাড়তেই বাবা বললেন, "একটু বেরিয়ে আসুন, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।"—আমাকে বললেন, "তুই চ'লে যা।" তারপর থেকে আমাকে আর বেরুতে দেন না, তোমার কাছেও তো একলা এলে ওঁরা পছন্দ করেন না। কাল আমাদের একজন মাষ্টার মশাই আসেননি—শেষ ঘণ্টার ক্লাশটা আর হ'লো না—তখন আমি গিয়েছিলাম ওখানে। মাসিমা ভয়ানক কাঁদছেন।'

আমি বললাম, 'মণ্টু, আমাকে একবার নিয়ে যাবি আজ ওখানে?'

'কী ক'রে? তোমাকে তো ওঁরা বেরুতেই দেবেন না।'

'ওঁদের কথা আমি শুনবো না।'

'তাহ'লে যাবে—যেতে পারবে সত্যিই?'

'নিশ্চয়ই যাবো মণ্টু, সত্যি আমি যাবো। তুই আমার সঙ্গে চল।'

আমি চটপট কাপড় ছেড়ে নিচে মার কাছে নেমে এলাম। বসবার ঘরে গলা পেলাম অন্য লোকের—খুব পরিচিত গলা—কে? মণ্টু পরদা ফাঁক ক'রে মাথা গলাতেই মা বললেন, 'মণ্টু, দিদিকে ডেকে নিয়ে এসো তো, বলো গিয়ে জ্যাঠামশাই এসেছেন—তোমার অভিলাষ-দার বাবা।'

মণ্টু মুহূর্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।—'দিদি, সর্বনাশ! বুড়ো তো এসেছে!'

আমি ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে বললুম, 'চুপ।'

মাকে বলতে শুনলুম, 'কেন আমার অমত হয়েছে সে-কথা আমি কাউকেই বলবো না। তবে দেখুন, আমার ইচ্ছেটাই তো ইচ্ছে নয়—মেয়েও তো বড়ো হয়েছে!'

'সে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু আপনি হঠাৎ কেন বেঁকে বসলেন সেটাই আমার অবাক লাগছে। এ-বিয়ে না-হ'লে অভি সাংঘাতিক আঘাত পাবে। আপনি জানেন, অভি পাত্র হিশেবে লোভনীয়—যে-কোনো সমাজে যে-কোনো মা-বাবার কাছে। কিন্তু আমি ওর কাছে অনেক ভালো-ভালো

মেয়ের প্রস্তাব ক'রেও ব্যর্থ হয়েছি। এখানে ওর ছেলেবেলাকার সম্বন্ধ—'

মা একটু নরম হলেন, বললেন, 'কিন্তু কী করবো দত্তমশাই, মেয়ে আমার ছোটো নেই—তার নিজেরই যখন মনস্থির হচ্ছে না তখন আমাদের আর বলবার কী আছে?'

'ও, মেয়ে!'—অভির বাবা হাসলেন, 'ছেলেমানুষ—কোথায় কোন মোহ লেগেছে চোখে—ও আর কদ্দিনের বলুন?'

ইতিমধ্যে বাবা ঢুকলেন ঘরে, 'আরে, গোপালবাবু যে—কবে এলেন?'

'এসেছি ভাই আজকেই—কিন্তু তোমাদের কী ব্যাপার বলো তো? অভি তো কেঁদে-কেটে প্রকাণ্ড এক চিঠি লিখেছে আমাকে।'

'সে কিছু না—' বাবা কোট ছেড়ে একটা কৌচে ব'সে পড়লেন।

'তোমার স্ত্রীরও তো দেখছি মন বিগড়েছে।'

'আর মেয়েদের কথা বলেন কেন? আজকালকার ছেলে-মেয়েদের অসভ্যতার অন্ত আছে? তাঁরা এখন নিজেরা করবেন পাত্র নির্বাচন। যত সব—' বাবা বিরক্তিভরে কথাটা শেষ করলেন না।

গোপালবাবু বললেন, 'সত্যি নাকি হে, একটা কোন দোকানদারই নাকি—'

'রাবিশ! রাবিশ!—অভি লিখেছে নাকি আপনাকে এ-সব কথা?'

'তাই তো আমি এলাম—আমার ছেলে পাগল হ'য়ে আছে তোমার মেয়ের জন্য। আর হবেই বা না কেন বলো? এইটুকু থেকে তো?'

'নিশ্চয়ই। আপনি ভাববেন না, সব ঠিক হ'য়ে যাবে। ঐ দোকানদার ছোঁড়াকে কোনোরকমে সরাতে হবে এখান থেকে—কিন্তু দেখুন, দোকানদারি করে বটে ছোঁড়া, কিন্তু কী অদ্ভুত কথাবার্তা,—আর তেজ কত!'

'তুমি গিয়েছিলে নাকি সেখানে?'

'গিয়েছিলাম একদিন—আচ্ছা ক'রে শাসিয়ে দিয়ে এসেছি।'

এতক্ষণ মা চুপ ক'রে ছিলেন, এইবার বললেন, 'কী অন্যায়! আমি তো এ-কথা জানিনে। তুমি শাসাবার কে?'

'তুমি চুপ করো। ওঃ-হো—' বাবা পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে মার হাতে দিলেন—'অভি লিখেছে দেখ। আর শোনো—আমার চা-টা এ-ঘরেই পাঠিয়ে দাও গিয়ে। রুনি কোথায়, রুনিকে ডাকো।'

মা উঠছিলেন, আমি নিজেই গিয়ে ঘরে দাঁড়ালাম।

'এই যে মা, এসো, এসো—' অভির বাবা তাঁর চিরধূর্ত চক্ষু দিয়ে আমাকে লক্ষ্য ক'রে উঠে এসে কাঁধে হাত রাখলেন, আমি নিচু হ'য়ে প্রণাম করলাম।

মা চিঠি খুলে পড়তে-পড়তে বললেন, 'রুনি, যা তো মা, ওঁদের চা-টা একটু দেখে নিয়ে আয়।'

আমি চায়ের ব্যবস্থা ক'রে খাবার ঘরে ঢুকতেই মা আমার হাতে অভিলাষের চিঠিটা দিলেন। একটু এ-কথা ও-কথার পরে বেরিয়ে এলাম চিঠি নিয়ে। ইচ্ছা করলো টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলি, কিন্তু নিতান্তই কৌতুহলবশত চিঠিখানা আমি না-প'ড়ে পারলাম না।—

'কাকিমা'

আমাকে যে-অপরাধের জন্য আপনি এত বড়ো শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন—আর-কেউ না-জানলেও আমি মনে-মনে জানি, অত বড়ো শাস্তি আমার প্রাপ্য নয়। যে-কথা ব'লে আমি আপনার অপ্রীতিভাজন হয়েছি, সে-কথা একান্তই আমার কল্পনাপ্রসূত নয়—তার প্রকৃত কারণ ছিলো ব'লেই আমি অকপটে তা প্রকাশ করেছিলাম—হ'তে পারে সেটা আমার ভুল ধারণা, তবে এ-ধারণা সত্যিও হ'তে পারতো। অবিশ্যি সত্যি না-হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। লুকোচুরি করা আমার ধাত নয়, সেটাই শেষ পর্যন্ত আমার শাস্তিভোগের কারণ হ'লো?'

এই পর্যন্ত প'ড়ে ঘৃণায় আমার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হ'য়ে উঠলো। অভিলাষ আর কত নিচে নামবে? ভগবান, তুমি তো জানো,—তুমি তো আছো—তুমি আমাকে রক্ষা করো—বাঁচাও আমাকে এ-অপমান থেকে। সমস্ত শরীরে

মনে আমি বল আনবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু পারলাম না, আমার শরীর-মন যেন ভেঙে চুরমার হ'য়ে যেতে চাইলো।

মা কিন্তু ঐ চিঠি নিয়ে আর-কোনো কথা আমাকে বললেন না—হয়তো তাঁর মনে সন্দেহ হয়েছিলো, কে জানে। বিনা অপরাধে আমি চোরের মতো চলা-ফেরা করতে লাগলাম।

৯

তিন চার দিন কেটে গেলো, আমি তার কোনো খবর পেলাম না—কেমন আছে কিছু জানলাম না, মণ্টুও ফাঁক পেলো না যাবার। আমার মনের অবস্থার কি কোনো বর্ণনা আছে? এর মধ্যেই ধুমধাম ক'রে একদিন আমার আশীর্বাদ হ'য়ে গেলো—মা ঠেকাতে পারলেন না বাবাকে, কিংবা চেষ্টাই করেছিলেন কিনা তা-ও জানি না।

সমস্ত ঠিকঠাক ক'রে—একবারে বাবাকে দিয়ে লিখিয়ে-পড়িয়ে—সমস্ত পাকা ব্যবস্থা ক'রে অভির বাবা বিদায় নিলেন।

মা দু'একদিন চুপ ক'রে থাকলেন, তারপর আস্তে-আস্তে বোঝাতে লাগলেন, 'অভি যদি কোনো মন্দ কাজ ক'রেই থাকে, তোকে পাবার জন্যই করেছে। তা ছাড়া কী করবো বল, ওঁর জেদ তো জানিস।'

ঘৃণায় মার দিকে তাকাতে পারলাম না। ভাবলাম, মৃত্যু তো অন্তত আছে।

অভি রাক্ষস! এই দেহের গন্ধ ওর নাকে লেগেছে। ও ছাড়বে না—কিছুতেই ছাড়বে না ভোগ না-ক'রে। তারপর দেবে ফেলে। আমার অহংকারের শাস্তি দেবে ও।—আচ্ছা!

সময় ব'য়ে যেতে লাগলো—লক্ষ-লক্ষ হাতি যেন আমার বুক মাড়িয়ে যেতে লাগলো—আমি শুকিয়ে গেলাম—আমার চোখ-মুখ ব'সে গেলো—কিন্তু আমার বাবার দয়া হ'লো না। মার মনের কথা জানিনে—কেননা তিনিও ক্রমশই বিষণ্ণ হ'য়ে যেতে লাগলেন।

বিয়ের দিন ঘনিয়ে আসতে লাগলো—আস্তে-আস্তে আত্মীয়স্বজনে ভ'রে উঠলো বাড়ি। বাবা প্রচুর উৎসাহে গহনা গড়াতে দিলেন, এলো শাড়ির দোকানের লোক—বিছানা বাক্স খাট টেবিল চেয়ার—মৃতের মতো নির্জীব চোখে সমস্ত দেখতে লাগলুম আমি। আমার নানা সাইজের নানা সম্পর্কের ভাই-বোন—কাকা জ্যাঠা মামা মামী—আত্মীয়-স্বজন কেউ বাদ গেলো না বিয়েতে আসতে।

আমি কথা বললাম না—আত্মহত্যা করবার সুযোগ খুঁজলাম না। মনে-মনে বললাম, যাঁরা আমাকে এ-সংসারে এনেছেন তাঁদের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। কিন্তু সে কেমন আছে? যদি একবার তাকে দেখতে পেতাম!

সারাক্ষণ আমাকে ঘিরে আছে লোকজন। ঠাট্টা তামাসা রসিকতা—আমি চেয়ে থেকেছি মুখের দিকে—কানে যায়নি কিছু।

বিয়ের দিন আমার মন পাগল হ'য়ে উঠলো। কী করি—কোথায় যাই—কেমন ক'রে রক্ষা পাই এদের হাত থেকে। বুকের মধ্যে কান্না কেবল গুমরে উঠতে লাগল। কেমন ক'রে মানুষ আত্মহত্যা করে? আমি ভেবে উঠতে পারলাম না, কী উপায়ে আমি মৃত্যুর অতল শন্তিতে পৌঁছতে পারি।

সন্ধ্যাবেলা আমাকে সাজানো হ'লো। মূল্যবান শাড়িতে গয়নাতে আলতায় কাজলে—মেয়েরা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমাকে দেখে-দেখে মুগ্ধ হ'তে লাগলেন—এর মধ্যে রব উঠলো, 'বর এসেছে, বর এসেছে।' অভিলাষ এসেছে? সমস্ত শক্তি আমার হঠাৎ সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠলো ওর বিরুদ্ধে—সবাই একযোগে ছুটলো বর দেখতে—মুহূর্তে আমি আলনা থেকে একটা শাদা চাদর টেনে সমস্ত শরীর ঢেকে বাথরুমের পিছনের দরজা খুলে মেথরের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে সোজা এসে নামলাম রাস্তায়···তারপর দিগ্বিদিক-জ্ঞানহারা হ'য়ে কেমন ক'রে যে ঠিক রাস্তা দিয়ে দোকানে এসে পৌঁছলাম জানি না। ওর কাছে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লাম আমি।

ঘরে ঢাকনা-দেওয়া মৃদু আলো জ্বলছিলো—চুপ ক'রে চোখ বুজে শুয়ে ছিলো কপালে হাত রেখে—আমার স্পর্শে হঠাৎ চমকে ব'লে উঠলো, 'কে? কে?'

'আমাকে রক্ষা করো, আমাকে বাঁচাও—' আমি ওর পায়ের উপর মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠলাম।

'তুমি এসেছো? তোমার না আজ বিয়ে!' ওর গলার স্বর শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছলো। 'তুমি কি—তুমি কি পালিয়ে এসেছো? বলতে-বলতে ও কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে ব'সে আমার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে গেলো।

'তুমি তো আমাকে কেড়ে আনলে না, ছিনিয়ে আনলে না ওদের হাত থেকে—' আমার মুখ ও তুলে ধরলো, মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে বললো, 'ঈশ, কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে—এই ভালো হ'লো, তুমি নিজেই এলে আমার কাছে। কেড়ে আনা—সে তো কেড়ে আনা; সেটা তো জয় নয়—এই আমার জয় হ'লো।' ক্লান্তভাবে ও শুয়ে পড়লো আবার—বললো, 'আমি বড়ো দুর্বল, বড়ো অসুস্থ, তুমি কাছে এসো।'

আমি ওর মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বললো, 'এখানে কেউ সাক্ষী নেই, কিন্তু উপরে যিনি আছেন—যাঁর কাছে মানুষের আর-কোনো পরিচয় নেই, যাঁর দয়ায় আমরা এমন অদ্ভুত দুর্দৈবের মধ্যেও মিলিত হ'তে পারলাম—তিনি থাকলেন সাক্ষী।' আমার হাত ধ'রে ও ঈষৎ আকর্ষণ করলো—আমি মুখ নিচু করলুম—আমাদের বিবাহের প্রথম প্রণয়-চিহ্ন ও এঁকে দিলো আমার মুখে।

মুখ তুলতেই দেখলুম, দরজায় ওর মা স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে

আছেন। মাকে দেখে বললো, 'মা, ও এসেছে, ঈশ্বর রইলেন সাক্ষী—তার চেয়ে বড়ো পুরুত তো আর নেই—তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো।' আমি আনত মুখে উঠে দাঁড়ালাম। ওর মা কাছে এসে নিঃশব্দে আমার মাথায় হাত রাখলেন।

১০

কিন্তু পরমুহূর্তেই বাইরের দরজায় ত্রস্ত করাঘাতে আমরা তিন জনেই আঁৎকে উঠলাম একসঙ্গে। আমার বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মা বললেন, 'কিছু ভয় নেই, তুমি ওর কাছে বোসো—আমি দেখছি।' দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গেই যিনি সবেগে ঘরে ঢুকলেন তাঁর আকুল কণ্ঠে বুঝলাম তিনি আমার মা। 'কোথায় আমার মেয়ে, নিশ্চয়ই এখানে আছে, দিন, বার ক'রে দিন—'বলতে-বলতে তিনি ওর মাকে গ্রাহ্য না-ক'রে ভিতরের দিকে এগিয়ে এলেন—সঙ্গে-সঙ্গে আমিও কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। 'হতভাগী, এই তোর মনে ছিলো? এত লজ্জা, এত অপমান আজ তোর জন্য!' আমি মার বুকে মুখ রেখে বলাম 'আমার লজ্জা, আমার অপমান, সেও তো তোমরা দেখনি, মা।'

মা ব্যাকুলভাবে বললেন, 'রুনি, তুই আমার মেয়ে, আমার দিকে ছাখ—তোর খোঁজ পড়তেই আমি সবাইকে ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে রেখে মুহূর্তে এখানে ছুটে এসেছি—আমি বুঝেছি তুই

এখানেই এসেছিস। আমার মান রাখ—আমাকে সমাজ থেকে এ-ভাবে চ্যুত করিসনে—চল তুই, আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি, মুহূর্তে তোকে লুকিয়ে নিয়ে যাবো। কেউ জানতে পারবে না।'

আমি নিষ্ঠুরের মতো মার উদ্‌ভ্রান্ত চোখের দিকে নিরুত্তরে তাকালাম, আর মা আমার হাত জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে লাগলেন। একটু পরেই তিনি আমাকে ছেড়ে এগিয়ে গেলেন ওর দিকে—ওর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে নিজের গা থেকে মহামূল্য সমস্ত অলংকার একটি-একটি ক'রে খুলতে-খুলতে বলতে লাগলেন, 'সব নাও—সব নাও, কেবল আবার মেয়েকে ফিরে যেতে বলো—তুমি বললেই ও যাবে—আমাকে বাঁচাও—আমার সমস্ত লজ্জা আজ ঢেকে দাও তুমি।'

পিছন থেকে এবার ওর মা এগিয়ে এলেন।—'সুবালা, টাকা কি তোকে আজ এতই নিচে নামিয়ে এনেছে, মেয়েকে পণ্য করতেও তোর লজ্জা হয় না?' গলা শুনে হঠাৎ মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ালেন আমার মা।

মার সেই ভঙ্গি আমার চিরজীবন মনে থাকবে—হঠাৎ একটা সাপের উপর পা পড়লে মানুষের যে-চমক লাগে, ঠিক সে-রকম ক'রে তিনি আঁৎকে উঠে আর্তস্বরে বললেন, 'দিদি, তুমি?'

'সুবালা, তুমি এ-ঘরে এসো।'

তিনি আমার মার হাত ধ'রে অন্য ঘরে চ'লে গেলেন—আমি স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে।

সে-রাত কেমন ক'রে কেটেছিলো তার নির্দিষ্ট কোনো চেতনা আমার ছিলো না—এটুকু জানি, আরো অনেক রাত্রির মতো সে-রাতের পরেও আবার ভোর হয়েছিলো, সূর্য উঠেছিলো।

কিন্তু এ-লজ্জা আমি লুকোবো কোথায়? এ আমি কী করলাম? কেন করলাম? নিজের মনের কাছে লক্ষ-লক্ষ বার কেবল এই প্রশ্ন ক'রে-ক'রে আমার রাত ভোর হ'য়ে গেলো। আস্তে-আস্তে রোদ এলো জানলা দিয়ে—কিন্তু আমি ঘর থেকে বেরুতে পারলাম না, অপরাধের গুরুভারে আমি স্থবির হ'য়ে ব'সে-ব'সে নিজেকে ধিক্‌কার দিতে লাগলাম।

পাশের ঘরে ওর মার চলাফেরার শব্দে আমার শরীর যেন আরো কণ্টকিত হ'য়ে উঠতে লাগলো। ওর গলা শুনতে পেলাম, 'মা, ও কি এখনো ওঠেনি?'

মা বললেন, 'জানি না।'

'মা, তুমি কি রাগ করেছো?'

'রাগ? রাগ করবো কেন রে?'

'তোমাকে কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।'

'বুঝিস না তুই? কী একটা ঝড় গেলো—এমন কখনো সত্যি-সত্যি ঘটে মানুষের জীবনে?'

'কিন্তু ওর কী দোষ, মা—এ ছাড়া ওর অন্য উপায়ই বা ছিলো কী—আর তুমি তো সমস্তই জানো—সত্যি-সত্যিই যদি ওর সঙ্গে অভিলাষের বিয়ে হ'য়ে যেতো তবে আমরা কি কখনো ওকে

ক্ষমা করতে পারতাম? এ-কথা কি তুমি বলতে না যে ইচ্ছে না-থাকলে কখনো কেউ কাউকে বিয়ে দিতে পারে?'

মা হেসে ফেললেন—ঠাট্টা ক'রে বললেন, 'খোকা—তুই তো এর মধ্যেই বেশ বৌর পক্ষ নিয়ে কথা বলতে শিখেছিস!'

এর উত্তরে খোকা হাসলেন কিনা জানি না; ওর মা-ই আবার বললেন, 'দোকানটা আজও বন্ধ থাক, এতদিনই গেছে।'

'দোকানের লোকেরা আসেনি?'

'এসেছে, কিন্তু ওদের দিয়ে একটু অন্য কাজ করাবো। তোর মদনকে নিয়ে আমি বেরুবো একটু—ও-বেচারা আর বেনারসি প'রে কতক্ষণ থাকবে, বল?'

'শাড়ি কিনতে যাচ্ছো?'

'কিনবো না! আর ক'দিন পরে—বৈশাখের তেসরাই একটা বিয়ের তারিখ আছে—সমস্ত আয়োজন আমাকেই তো করতে হবে।'

'সে কী?' ও আঁৎকে উঠলো।

'বাঃ, তুই বিয়ে করবি না? সমাজে বাস করতে গেলে কত অনুষ্ঠান দরকার তা কি আমায় বোঝাতে হবে তোকে?'

খোকার শব্দ পাওয়া গেলো না। ওর মা আবার বললেন, 'কিছু ভাবিসনে তুই—সমস্ত আমি ঠিক করবো—আর তুই অত উঠে-উঠে ঘুরিসনে—এর মধ্যে সেরে ওঠাও তো চাই।'

এর পরে উনি আমার ঘরে এলেন। আমাকে ব'সে

থাকতে দেখে বললেন, 'তুমি উঠেছো? আমি একটু বেরুচ্ছি, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে ঐ ছোকরা চাকরটাকে বোলো, ও চা ক'রে দেবে—'

আমি ত্রস্তে বিছানা থেকে উঠে এলাম—উনিও দেরি না-ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

আমি চুপ ক'রে এসে দরজা ধ'রে দাঁড়ালাম। ও ডাকলো—কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মধুর হেসে হাত বাড়িয়ে দিলো আমার দিকে। আমি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে দেখলাম ওকে; কী সাংঘাতিক রোগা হ'য়ে গেছে, কিন্তু সেই রুক্ষ এলোমেলো চুলে ভরা শীর্ণ মুখশ্রীতে কী যে অদ্ভুত আনন্দের আভা ছিলো—আমি যেন আর চোখ ফেরাতে পারলুম না। হেসে বললো, 'কী দেখছো?' আমি লজ্জিত হ'য়ে চোখ নামালুম। বললো, 'মা একটু বাইরে গেছেন—আমি তো অচল—কী করবো, অতিথিকে আদর-যত্ন করবার আমার সাধ্য নেই, তুমি নিজেই দেখে-শুনে একটু চা-টা খেয়ে নাও।' আমি এসে মাথার কাছে দাঁড়ালুম—ঘন অবিন্যস্ত চুলের মধ্যে হাত রেখে বললুম, 'আমি বুঝি অতিথি?'

'অতিথি না? এর চেয়ে বড়ো অতিথি হয় নাকি? আর এর চেয়ে যোগ্য?'

'যাও—' আমি ওর মাথার উপর থেকে হাত সরিয়ে নিলুম রাগ ক'রে।

ও আমার হাত টেনে এনে কাছে বসালো। আদর ক'রে বললো, 'তুমি যে অতিথি নও, তার একটা প্রমাণ দাও তবে! এক্ষুনি যাও রান্নাঘরে, রামুকে ব'লে এসো চা দিতে।'

'বসি না তোমার কাছে একটু—খাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছো কেন? সত্যি আমার খেতে ইচ্ছে করছে না একটুও।'

'না, না—মা এসে রাগ করবেন—আর কাল রাত তো গেছে উপোসেই! যাও, লক্ষ্মী তো!'

আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে গেলুম। রান্নাঘর অবধি আমাকে যেতে হ'লো না—দেখলুম বাচ্চা চাকরটা হাসিমুখে চা নিয়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। সেখানে শুধু চা-ই নেই, আনুষঙ্গিক খাদ্য-দ্রব্য এত ছিলো যে কাছে আসতেই আমি বললুম, 'তুমি করেছো কী—অত আমি খাবো!'

'হুঁ বৌদি, তোমাকে নিঘ্ঘাত খাতে অবে—মা ব'লে গেচেন—' বিগলিত হাস্যে সে একেবারে গ'লে পড়লো।

ঘর থেকে ও ডেকে বললো, 'রামু, সব তুই নিয়ে আয়—বৌদির কথা শুনিসনে।'

রামু তার দাদাবাবুর আদেশ তক্ষুনি পালন করলো—আমি মুখ ধুতে চ'লে গেলুম।

ফিরে এসে দেখি, ভীষণ মনোযোগ দিয়ে সে চা ঢালতে বসেছে—আমাকে আসতে দেখেই হেসে বললো, 'নাও—তুমিই করো এ-সব। ভেবেছিলুম পারবো—কী ক'রে যে মেয়েরা

এ-সব কাজ ম্যানেজ করে!' হাত গুটিয়ে সে স'রে বসলো। আমি দেখলুম বিছানার চাদরে, ট্রের উপরকার কাপড়ে, মেঝেতে, সর্বত্র চায়ের দাগ। বললুম, 'এ তুমি কী করেছো? কে বলেছিলো?'—তাড়াতাড়ি একটা তোয়ালে এনে মুছে দিলুম, ব্যস্ত হ'য়ে ছোকরাটাকে ডেকে মেঝেটা পরিষ্কার করতে বললুম; ও নির্নিমেষে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমার ভাবভঙ্গি দেখে বললো, 'রানী, আমার মনেই পড়ছে না যে কোনোদিন তুমি ছিলে না এ-সংসারে।'

হঠাৎ আমি লজ্জাবোধ করলুম। সত্যিই তো, ঘর নোংরা হয়েছে বা বিছানার চাদরে চা পড়েছে এটা আমাকে এত বিব্রত করবে কেন? এ-বাড়ির সঙ্গে আমার কতটুকু সময়ের পরিচয়?

আমাকে থমকে দাঁড়াতে দেখে বললো, 'চাদরটা যত্ন ক'রে মুছলে, মেঝে পরিষ্কার করবার আদেশ দিলে, আর আমি অভাগা যে চিনি-মাখা চিটচিটে হাতে ব'সে আছি—' হেসে সে আমার দিকে দিব্যি পরিষ্কার হাত বার ক'রে দিলো।

আমি দুষ্টুমি বুঝে বললাম, 'সব তোমার চালাকি—কিছু হয়নি তোমার হাতে।'

'না সত্যি—দাও না মুছিয়ে হাতটা।' আমি হেসে কোলের উপর হাত টেনে নিয়ে পরিষ্কার হাত আরো পরিষ্কার ক'রে দিতে লাগলুম। এ-খেলা আমাদের কতক্ষণ চলতো

জানি না—গভীর আবেশে আমরা আত্মবিস্মৃত হ'য়ে ছিলুম—হঠাৎ আমি পিছনে তাকিয়ে অভিলাষকে দেখে থরথর ক'রে কেঁপে উঠলাম। আমার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট ভয়ার্ত শব্দ বেরতে ও-ও চমকে চোখ তুললো।

'বাঃ, দৃশ্যটি বেশ!' মুখের এক অশ্লীল ভঙ্গি ক'রে অভিলাষ পাশের একটা চেয়ারে কায়েমি হ'য়ে বসলো, আর আমি ত্রস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম। ও অভিলাষের দিকে তাকিয়ে একটু যে বিব্রত না হয়েছিলো তা নয়, কিন্তু তক্ষুনি সে-ভাব সামলে নিয়ে বললো, 'কী খবর, অভিলাষ?' আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'অভিকে একটু চা দাও, রানী।'

'উঃ, আবার নামকরণও হয়েছে, দেখছি!'

ও হেসে বললো, 'জানো তো, যে-মেয়ের মধ্যে সমস্ত গুণ থাকে তাকেই কেবল রানী আখ্যা দেয়া যায়।'

'আমি ফাজলেমি করতে আসিনি, শ্যামল—এসেছি তোমাকে সাবধান করতে। কুমিরের সঙ্গে লড়াই ক'রে তুমি জলে বাস করবে? এত স্পর্ধা তোমার কেমন ক'রে হ'লো?'

'তবে আমারও একটা কথা বলবার আছে, অভি। তোমারও তো স্পর্ধার সীমা দেখছিনে—কোন অধিকারে আমার অনুমতি ছাড়া আমার শোবার ঘরে এসে তুমি দাঁড়িয়েছো?'

'তোমার আবার শোবার ঘর!'—অভিলাষ হাসিতে ফেটে পড়লো। 'সারা বাড়ি একঘর—বার আর অন্দর। হাসালে,

হাসালে কিন্তু তুমি। এখানে থেকে যাও, রুনি, ওর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

আমি ভীত চকিত দৃষ্টিতে তাকালাম ওর দিকে—ও খপ ক'রে আমার হাত ধ'রে বললো, 'যা বলবার আমার স্ত্রীর সাক্ষাতেই বলতে পারো অভি—তুমি এখানে বোসো, রানী।' ওর পাশে আমাকে ও জোর ক'রে বসিয়ে দিলো।

'তোমার স্ত্রী! তোমার স্ত্রী! স্কাউণ্ড্রেল—কাকে তোমার স্ত্রী বলছো! লজ্জা করে না? জিজ্ঞেস করো তো ওকে, কার সন্তান ও বহন করছে দেহে?'

আমি আর্তস্বরে ডেকে উঠলাম, 'অভিলাষ!' আর শ্যামলের মুখে দপ ক'রে যেন আগুন জ্ব'লে উঠলো, আমাকে আড়াল ক'রে কাঁপতে-কাঁপতে উঠলো—তারপর একেবারে অভিলাষের মুখের কাছে গিয়ে রুখে দাঁড়ালো। হঠাৎ আমার মনে হ'লো, অভিলাষ এই চাইছে—ওর হাতে আজ অনেক ক্ষমতা—ওর গায়ে কেউ যদি হাত তোলে, রক্ষে আছে তার! আমি গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওকে, জোর ক'রে টেনে নিয়ে এলাম বিছানায়, কাঁদতে-কাঁদতে বললাম, 'তুমি যদি ওঠো, আর যদি একটি কথা বলো—মাথা খুঁড়ে মরবো আমি এখানে।' তারপর অভিলাষের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, জোড়হাত ক'রে বললাম, 'তুমি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে—যা তুমি পারো—যত শত্রুতা করতে তোমার প্রাণ চায় সব তুমি কোরো, কিন্তু এই

পাপ মুখ আর দেখিয়ো না আমাকে। যে-মুখ দিয়ে অত বড়ো মিথ্যা তুমি রটিয়ে বেড়াচ্ছো আমার নামে—সে-মুখ যেন তোমার পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়।'

'থ্যাঙ্ক ইউ,' আমার হাতে এক প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে অভিলাষ বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। আমি মুখ ফিরিয়ে ওর কাছে যেতেই ও উত্তেজিত হ'য়ে বললো, 'ওকে খুন ক'রে ফেলবো আমি—তাতে যা সর্বনাশ হয় হবে—ছাড়বো না, ছাড়বো না ওকে···যে-মুখ দিয়ে ঐ কথা ও উচ্চারণ করেছে সে-মুখ আমি ভেঙে ফেলবো!' বলতে-বলতে ও হাঁপাতে লাগলো। আমি ভয় পেয়ে কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বলতে লাগলাম, 'তুমি কি পাগল হ'লে—তুমি কি ছেলেমানুষ!'

## ১০

একটু পরে ও শান্ত হ'য়ে চোখ বুজে বললো, 'ভাখো, অভিলাষের বাবা গোপাল দত্ত যখন খেতে না-পেয়ে ম'রে যাচ্ছিলো তখন আমার বাবা আশ্রয় দিয়েছিলেন ওকে। কয়লার কারবার ছিলো ওদের—বাড়ি-বাড়ি কয়লা দিয়ে যেতো। আমাদেরও কয়লা আসতো ওর দোকান থেকে। এর মধ্যে একদিন ওঁর স্ত্রী আত্মহত্যা ক'রে মারা গেলেন। ভীষণ হৈ-চৈ পাড়ায়—আমার অস্পষ্ট মনে আছে ব্যাপারটা।

অভিলাষ তখন বছর চারেকের হবে—আমি বছর পাঁচেকের।' এই পর্যন্ত ব'লে ও চুপ করলো, আমি কৌতূহল চাপতে না-পেরে বললাম, 'তারপর' ?

'শুনবে ? শুনবে ওদের সব কীর্তি ?' হাতের উপর মাথার ভর রেখে ও আবার বললো, 'আসলে যিনি আত্মহত্যা করেন, তিনি কিন্তু অভিলাষের মা নন। ওদের বাড়িতে একটি বিধবা বৌ ছিলো—অভিলাষের খুড়তুতো বৌদি বোধ হয়—তারই পাপের পিণ্ড এই অভিলাষ। বৌটি নিতান্ত নিঃসহায় ছিলো—একদিন সে কেঁদে পড়লো শাশুড়ির কাছে—মুখ ফুটে বললো সে শ্বশুরের অত্যাচারের কথা—সমস্ত শুনে ভদ্রমহিলা স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন—কিন্তু সন্তান তিনি কিছুতেই নষ্ট করতে দিলেন না—বৌ নিয়ে তিনি কোথায় কোন নির্জনে গিয়ে গা-ঢাকা দিলেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে ছেলে কোলে নিয়ে নিজে ফিরে এলেন, কিন্তু বৌ আর এলো না। অভিলাষকে মানুষ ক'রে তুলতে লাগলেন তিনিই—মানে, গোপাল দত্তর স্ত্রী।

'কেন তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন কে জানে—লিখে রেখে গিয়েছিলেন, এ-জন্য কেউ দায়ী নয়।

'অনেক দিন ধ'রে এ নিয়ে চললো হৈ-হৈ, তারপর কেমন ক'রে ওর দোকান উঠে গেলো—আর গোপাল দত্ত ছেলে নিয়ে একবারে ভেসে বেড়াতে লাগলো। এর মধ্যেই একদিন দেখি আমার বাবা অভিলাষকে ধ'রে নিয়ে এসেছেন বাড়িতে—

আমাকে ডেকে বললেন, "খোকা, এই দেখ্ তোর জন্য কেমন বন্ধু এনেছি।" মা এসে দেখে বললেন, "ও মা, এ যে গোপাল কয়লাওলার ছেলে...বাঃ, ভারি সুন্দর তো।" বাবা বললেন, "মানুষ করো না তুমি—দেখছো কী উজ্জ্বল চোখ—বেঁচে থাকলে মানুষ হবে।" ময়লা কাপড়-জামা শুদ্ধই মা ওকে কোলে জড়িয়ে আদর করতে লাগলেন।

'এই ছেলের সূত্র ধ'রেই এলেন গোপাল দত্ত—খাল কেটে কুমির আনলেন বাবা। তিনি ছিলেন মস্ত উকিল, বললেন, "থাক লোকটা—মক্কেল-টক্কেল এলে বেশ দেখাশোনা করবে, বসাবে-টসাবে।" সামান্য কিছু মাইনের ব্যবস্থাও হ'লো। তারপর ক্রমে-ক্রমে ওর বাধ্যতায়, কর্মকুশলতায়, নম্রতায় বাবা এত অভিভূত হ'য়ে পড়লেন যে ও তাঁর ডান হাত বাঁ হাত হ'য়ে উঠলো। বাবা নিজে ছিলেন অত্যন্ত উদারচেতা সরলপ্রাণ মানুষ, গোপাল দত্তের ধূর্তামির তিনি তল পাবেন কেমন ক'রে? আমার মা-ও ওর ধূর্তামিতে দিক্‌ভ্রান্ত হলেন—অর্থাৎ কয়েক বছরের মধ্যে ও এ বাড়ির সর্বময় কর্তা হ'য়ে দাঁড়ালো। আর অভিলাষকে ভালো না-বেসে উপায় ছিলো না—প্রথমত ও খুব তুখোড় ছেলে, আর তার উপর দেখতে ভালো। আমার যখন এগারো বছর বয়স—তখন হঠাৎ একদিন বাবা কোর্ট থেকে যে ফিরলেন তা সজ্ঞানে নয়। স্পষ্ট মনে আছে মা খবর পেয়ে ছুটে গেলেন গাড়ির কাছে—বাবার অচেতন দেহ

ধরাধরি ক'রে নামানো হ'লো, বরাবরই তাঁর ব্লাডপ্রেশার ছিলো—তার মধ্যে কোনো নিয়ম মানতেন না—ঐ তাঁর শেষ শয্যা হ'লো। সমস্ত টাকাপয়সা পড়লো এবার গোপালের হাতে। মা পাগলের মতে দু'হাতে খরচ করতে লাগলেন—আর সেটা হ'তে লাগলো গোপালের হাত দিয়ে। জন বলতে একমাত্র গোপালই ছিলো কাছে—আর সে করলোও খুব—এমন করা করেছিলো যে নিজের ছেলেও কখনো বাবাকে অত করতে পারে না। কে জানে হয়তো বাবাকে ও ভালোই বাসতো। বেঁচে ছিলেন বাবা মাত্র পনেরো দিন—পনেরো বছরও বোধ হয় মানুষের তার চেয়ে সহজে কাটে।

'বাবার মৃত্যুর তিন মাসের মধ্যেই গোপাল আমার মাকে একেবারে পথে বসালো। ইনশিওরেন্স ছিলো চল্লিশ হাজার টাকার—নগদ টাকাও ছিলো কিছু আর টাকাপয়সা সব গোপালের হাত দিয়েই তো মা তোলাতেন—বুদ্ধিও গোপালই মাকে দিয়েছিলো—অবশেষ তো দেখতেই পাচ্ছো। সমস্ত নিয়ে ও একদিন স'রে পড়লো ছেলে নিয়ে। মা আর কী করবেন।—বাড়িখানা ছিলো—আর মার গয়না যা ছিলো তাই দিয়ে চললো অনেক দিন। আমি স্কলারশিপ পেতাম—তাতেও কিছু সুবিধে হ'লো। এম-এ-পাশ করবার পরে বাড়ি বিক্রি ক'রে দিয়ে মাকে নিয়ে কলকাতা চ'লে এলুম। চাকরির জন্য ঘুরলুম কিছুদিন, তারপর মার বুদ্ধিতেই দোকান দিলুম।'

এক নিশ্বাসে এত কথা ব'লে ও একটু চুপ করলো—তার পরে মৃদু হেসে বললো, 'অবিশ্যি দোকান দিয়েছিলুম ব'লেই না তোমার দেখা পেলাম। অভিলাষ টাকার মালিক হ'লো—কিন্তু ছ্যাখো, ভবিতব্য এসে কোথায় ঠেকলো, ঐ হতভাগ্য পারলো না তোমাকে জয় করতে।'

আমি স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলাম, কথা বেরুলো না মুখ দিয়ে। খানিক পরেই ওর মা এলেন—গায়ের চাদরটা ছেড়ে চেয়ারের হাতলে রেখে বললেন 'খোকা, আজ একটা সাংঘাতিক কাণ্ড দেখে এলাম। তোর শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলাম।'

আমি চমকে চোখ ফেরালাম। উনি হেসে বললেন, 'বলছি—ওরে', তিনি আবার বাইরে গিয়ে চাকরকে ডাকলেন—'ঐ ছ্যাখ, দোকানঘরে একটা বাক্স রেখে এসেছি—নিয়ে আয় তো।'

ঘরে এসে ছেলের কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'ভালো আছিস তুই? খেয়েছিলি কিছু? বৌমা? ও মা, এ কী! সব যে যেমন-তেমন প'ড়ে আছে।'

আমি অপরাধীর দৃষ্টি তুলে ধরলাম তাঁর দিকে—বললাম, 'খেতে পারিনি।'

সঙ্গে-সঙ্গে ও বললো, 'অভিলাষ আমাকে শাসাতে এসেছিলো, মা—কোনো বিপদে ফেলবার মতলব আছে।'

'এসেছিলো অভিলাষ? কী আশ্চর্য! ও-বাড়িতে কী

কাণ্ড! অভিলাষের বাবা ক্ষতিপূরণ বাবদ দশ হাজার টাকার দাবিতে মোকদ্দমা করবে ব'লে শাসাচ্ছে তোর শ্বশুরকে—আবার এদিকে অভিলাষ দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হ'য়ে বলছে যে রুনিকে যে ক'রে পারে ও নেবেই কেড়ে—আজ হোক, কাল হোক, মুখে কাপড় বেঁধে হোক, যে ক'রে হোক। এই তাণ্ডবের মধ্যে হঠাৎ এক পাহাড়ি মেয়ে এইটুকু এক ছেলে কোলে ক'রে এসে হাজির—অনেক খুঁজে-খুঁজে সে অভিলাষের খোঁজ পেয়েছে—সে বলছে যে এই ছেলে অভিলাষের। ছেলে যখন সাত মাসের পেটে তখনই সে সটকেছে—মেয়েটি অনেকবার চিঠি লিখে জবাব পায়নি। তার জাত-ভাইয়েরা সকলে বলছে বাংগালিবাবুরা এ-রকমই—তুমি চ'লে যাও সেখানে—বলো গিয়ে, হয় তোমাকে নিয়ে থাকুক, নয়তো এতদিনকার সব খরচ আর খোরপোষের ব্যবস্থা ক'রে দিক।' অভিলাষের বাবা বলছে এই ছেলে যে অভিলাষের তার তো কোনো প্রমাণ নেই। মেয়েটা কেঁদে ভাসাচ্ছে—বলছে যে আমি একটা ভদ্র মেয়ে, আমি কি এ-ভাবে মিথ্যে ব'লে নিজেকে বে-ইজ্জৎ করবো? ওকে ডাকো—ও বলুক আমার কাছে এ ছেলে ওর কিনা—যদি মিথ্যা কথা বলে আমি ওকে কেটে দু টুকরো করবো।

আমরা দুজন স্তম্ভিত হ'য়ে পরস্পর চাওয়া-চাওয়ি করলাম। কী আশ্চর্য! যে-মিথ্যা অপবাদে ও আমাকে এমন কলঙ্কিত করলো—সে-অপবাদই সত্যি হ'য়ে দেখা দিলো ওর জীবনে?

ওর মা এবার সুটকেসটা কাছে এনে বললেন, 'এসো, মা—ছাখো এসে তোমার জিনিশপত্র পছন্দ হয় কিনা।'—শাড়িতে গয়নায় সুটকেসটি ভ'রে আছে। সমস্ত তুলে-তুলে তিনি আমাকে দেখালেন। বললেন, 'তোমার বাবার গয়না তাঁকেই ফিরিয়ে দিয়ো, মা—তুমি হ'লে আমার গরিবের ঘরের বৌ, ও-গয়না কি তোমার গায়ে মানায়? খোকা যে-দিন পারবে, সমস্ত গা মুড়ে দেবে তোমাকে সোনা দিয়ে।'—একটু হেসে বললেন, 'আর গয়নায় কী-ই বা দরকার—কী আমার সোনার ছেলে—অমন স্বামী পেলে কি আর মেয়েদের অন্য কিছুর প্রয়োজন থাকে? কী বলো?' আমার মাথায় তিনি হাত রাখলেন। ও হেসে বললো, 'বেশি বোলো না, মা—নিজের ছেলেকে অমন সবাই ভাবে। কিন্তু একটা কথা না-ব'লে পারলাম না—বিয়ে তো একা-একা ওরই না—আমারও তো বিয়ে, আমার জন্য তো কিছু আনলে না?'

'আনিনি? এই ছাখ', হেসে তিনি বার করলেন ধুতি—তোয়ালে—গেঞ্জি—তারপর হাতের আড়ালে লুকিয়ে বললেন, 'বল তো আর কী এনেছি—বলতে না-পারলে পাবি না।'

'বলবো? বলবো? আচ্ছা—একখানা জিভ-বের-করা কালী-মার ছবি। না, না, রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি—ওঃ হো—'

'দুষ্টু ছেলে—কী আমার ভক্তির সাগরখানা রে'! হাসতে-হাসতে তিনি বার করলেন সুন্দর একটি দামী ফাউণ্টেন পেন।

ছোটো ছেলের মতো আনন্দে অধীর হ'য়ে সে কেড়ে নিলো মার হাত থেকে কলমটা—ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগলো বারে-বারে।

হাসিমুখে মা বললেন, 'এই কলম দিয়ে কিন্তু প্রথমে আমি লিখবো।'

'ঈশ, সে আর হয় না!'

'সে হ'তেই হবে—তাহ'লে খুব ভালো বৌনি হবে, পয়া হবে তাহ'লে কলমটার। কী লিখবো তা তো তোরা ভাবতেই পারবি না। কিন্তু আর বসবার সময় নেই—আমাদের রামচন্দ্র এতক্ষণে কী করছেন কে জানে।' ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে তিনি আমাকে জিনিশপত্র গুছিয়ে রাখতে ব'লে রান্নাঘরে গেলেন।

## ১১

খেতে-খেতে আমাদের বেলা গেলো। খেয়ে উঠে তিনি আমাকে দিয়ে বিয়ের নিমন্ত্রণ চিঠি লেখাতে বসলেন ঐ কলম দিয়ে লাল কাগজের উপর। অতি অল্প কয়েক জন—তার মধ্যে একখানা আমার বাবার নামে—সে-চিঠিখানা এই রকম—

'প্রিয় বিজয়,

'তুমি এতক্ষণে আমার কথা অবশ্যই সুবালার কাছে শুনেছো। সংসারটা এই রকমই—মানুষে গড়ে আর বিধাতা ভাঙেন—আবার বিধাতা গড়েন, মানুষ ভাঙে—এই ভাঙাগড়ার খেলাই চলছে কেবল লোকে আর অলৌকিকে।

'তোমার কন্যা তোমার পক্ষে এবং আমার পুত্র আমার পক্ষে সমান আদরের ও আনন্দের। সন্তানের তুল্য স্নেহের জিনিশ আর মানুষের জীবনে কিছুই নেই। নিতান্ত হতভাগ্য না-হ'লে মানুষ এ-আনন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না—এই স্নেহের অনুভব যে কী তীব্র, কী আনন্দময় সে-কথা প্রত্যেক পিতা-মাতাই জানে—আর সন্তানের জীবনেও পিতা-মাতা যে কী, তা অনায়াসেই প্রত্যক্ষ করতে পারি, যখনই কোনো পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ শিশুকে আমরা দেখি। এতখানি ভূমিকা করলাম এইজন্য যে আমার পুত্র আজ তোমার কন্যার পাণিপ্রার্থী এবং তোমার কন্যা আজ আমার পুত্রকে বরণ করতে ইচ্ছুক—এদের এই যুগল ইচ্ছাকে আমি অভিনন্দিত করবার মানস করেছি—তুমি এবং সুবালা এদের মিলিত জীবনকে কি প্রাণ ভ'রে আশীর্বাদ জানাবে না?

'এর পরে কয়েকটি কথা আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—তোমাদের পক্ষে ঋণ-শোধের এমন সুযোগ আসবে না, আমারও সে-দান গ্রহণ করবার অন্য-কোনো উপলক্ষ আসবে না।

'মনে থাকতে পারে তোমার আর সুবালার মিলনের মধ্যে আমি যে-পার্টটি নিয়েছিলাম সেটি নিতান্ত অবহেলার যোগ্য ছিলো না। সুবালার দরিদ্র পিতা যখন কিছুতেই মেয়ের বিবাহ দিতে পারছিলেন না এবং তখনকার আট বছরের গৌরীদানের যুগেও যখন সুবালা ষোলো বছরের হ'য়ে ঘরে থাকলো—সেই সময়ে তার সঙ্গে তোমার দেখা আমার স্বামীর সূত্রেই হয়েছিল—এবং যুবজনোচিত মুগ্ধতায় তুমি তাকে না-পেলে আত্মহত্যার পর্যন্ত সংকল্প করেছিলে এবং তোমার দাম্ভিক পিতা বলেছিলেন, "ভিখারীর ঝাড় বাড়িতে আনবো আমি? আমি কি শেষে বিজয়ের বাপ হ'য়ে বিজয়ের ইচ্ছাকেই বড়ো ক'রে দেখবো? তার চেয়ে অমন ছেলেকে আমি চাবুক দিয়ে সোজা করবো না"?'

এই সময় আমি কলম থামিয়ে অবাক হ'য়ে মার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কী আশ্চর্য!'

উনি বললেন, 'আশ্চর্য বইকি, মা—নিজে ভুক্তভোগী হ'য়েও তিনি বাপের দম্ভ ফলালেন তোমার উপর। হ'লো তো শিক্ষা?'

আমি একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'কিন্তু আপনাদের সঙ্গে বাবারই বা কী ক'রে আলাপ, মারই বা কী ক'রে আলাপ?'

মা বললেন—

'আমার স্বামী ছিলেন উকিল, আমার শ্বশুরও তা-ই।

প্রথম পাশ ক'রে বিজয় আমার শ্বশুরের জুনিয়র ছিলেন অনেক দিন—সেই সময় তোমার শ্বশুরের সঙ্গে ওঁর খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। উনি তোমার বাবার চেয়ে বয়সে বড়ো ছিলেন কিছু, আর বিয়েও আমাদের খুব ছোটো বয়সে হয়েছিলো। সুবালার বাপের বাড়ি আর আমার বাপের বাড়ি ছিলো পাশাপাশি। শ্যামল যখন হ'লো, আমি তখন বাপের বাড়ি ছিলাম—সেই সময়ে যে উনি গেলেন আমাকে দেখতে—তখন সঙ্গে বিজয়কে নিয়ে গেলেন বেড়াতে। তখনই এদের দেখাশোনা হ'য়ে ব্যাপারটা ঘটলো। তোমার শ্বশুর তো তখন ওকালতি করবেন না স্থির করেছিলেন, প্রফেসরি করছিলেন—পরে অবিশ্যি বাপের পিড়াপিড়িতে ল পাশ ক'রে উকিল হ'য়ে বসলেন, এবং বলাই বাহুল্য তখন আমার শ্বশুর সমস্ত মনটা ছেলের দিকেই দিয়েছিলেন। বিজয় তখন চ'লে এলো কলকাতায়। একেবারে হাইকোর্টে এসে বসলো। সে কি আজকের কথা! তিরিশ বছর হ'য়ে গেলো। —হ্যাঁ, কী না লিখছিলে পড়ো তো একটু—' আমি চিঠির শেষাংশটুকু পড়তেই তিনি আবার বলতে লাগলেন—'তোমার বাবার এই কথা শুনে ভয়ে তুমি এতটুকু হ'য়ে গেলে—আমার স্বামীকে বললে, "আপনি তো ইচ্ছে করলেই আমাকে রক্ষা করতে পারেন—আপনি আমাকে বাঁচান।" তিনি বললেন, "ভেবো না বিজয়, তোমার বৌদিকে ধ'রে পড়ো, তিনি নিশ্চয়ই

গতি ক'রে দেবেন।" সুবালাকে আমি কত ভালবাসতাম তা কি তার একটুও মনে নেই ?

'মনে আছে ? সুবালার গায়ের সমস্ত গহনা তখন আমি গড়িয়ে দিয়েছিলাম ? আমার স্বামী তোমাকে বিবাহের খরচ বাবদ কিছু টাকাও দিয়েছিলেন—সেটা তুমি ধার ব'লেই নিয়েছিলে। ধার তুমি শোধ করোনি, করলে বাহুল্য হ'তো,—কেননা বিবাহের পরে তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে যখন অশ্রুপূর্ণ চোখে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলে, যখন বলেছিলে, "এ-ঋণ তো আমাদের জীবনে অক্ষয় হ'য়েই রইলো, তবু যদি কোনোদিন আপনাদের কোনো কাজে লাগি তো নিজেদের ধন্য মনে করবো," সে-দিনই অনেক পেয়েছিলাম আমরা।

'কালের প্রভাব বড়ো বিষম—উনি ওকালতি শুরু করাতে তুমি ক্ষুব্ধ হ'লে—চ'লে গেলে কলকাতা—তারপর সুখে-দুঃখে কত দিন কাটলো ( অবিশ্যি যতদিন তুমি বিখ্যাত না হয়েছিলে—যতদিন তোমার ফী-ই ভালো ক'রে জোটেনি, ততদিন এক-আধখানা চিঠি লিখতে ) কিন্তু যখন থেকে বড়োমানুষ হ'লে, খোঁজ-খবর নেবার প্রয়োজনও তোমার মিটে গেলো।

'আমি কলকাতায় আছি অনেকদিন—তোমার খবর অবিশ্যি জানতাম না—নেবার আগ্রহও বোধ করিনি—কিন্তু প্রথম যেদিন তোমার মেয়েকে দেখলাম—ঠিক এই বয়সের সুবালা

ভেসে উঠলো আমার চোখে। খবর নিয়ে জানলাম, আমার অনুমান অমূলক নয়।

'আজ তোমার কন্যাকে আমি পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করলাম। আশা করি কায়মনোবাক্যে তাদের জীবনকে জয়যুক্ত হবার আশীর্বাদ ক'রে আমাকে কৃতার্থ করবে। এই আমার নিবেদন—ইতি

তোমার বৌদি অরুন্ধতী মিত্র'